২৮ রবীন্দ্রস্মৃতি, পৃ: ২২

২৯ নৃত্য, পৃ: ১৩

৩০ তদেব

৩১ তদেব, পৃ: ১৪-৬

৩২ কাব্যগ্রন্থাবলী, ১৮৯৬-এর অন্তর্গত বাল্মীকিপ্রতিভার সূচনা, পুলিনবিহারী সেন সংকলিত ও সম্পাদিত রবীন্দ্রগ্রন্থপঞ্জী (১ম)-এ উদ্ধৃত, পৃ: ১৮ পাদটীকা দ্রষ্টব্য।

৩৩ গীতবিতান (অখণ্ড), ১৩৫৭, গ্রন্থপরিচয়, পৃ: ৯৬৯

৩৪ তদেব, পরিশিষ্ট ২, পৃ: ৯২৫

৩৫ রবীন্দ্রসঙ্গীত, পৃ: ১৯৫

৩৬ ছন্দ (প্রবোধচন্দ্র সেন সং), ১৯৬২, পৃ: ১৯১ ; চিঠির তারিখ ১ কার্তিক ১৩৩৬

॥ নৃত্যনাট্যে রূপান্তর ॥

(ক) চিত্রাঙ্গদা

চিত্রাঙ্গদা নাট্যকাব্য রচনার চল্লিশ বৎসরেরও অধিককালের ব্যবধানে রবীন্দ্রনাথ তাকে নৃত্যনাট্যে রূপান্তরিত করলেন—প্রথমটির প্রকাশকাল ১৮৯২, দ্বিতীয়টির ১৯৩৬ খ্রীস্টাব্দ। ডার্টিংটন হলে ব্যালে-নৃত্যানুশীলনের পরে কী ভাবে চিত্রাঙ্গদা নাট্যকাব্য অবলম্বনে নৃত্যনাট্য রচনায় হস্তক্ষেপ করা হয় সে কথা প্রতিমা দেবীর নৃত্য গ্রন্থ থেকে পূর্বেই বিবৃত করেছি। চিত্রাঙ্গদা নির্বাচনের বিশেষ কারণও তিনি বলেছেন, "কেন না, এই কবিতার সাংগীতিক আবেগ নাচের সম্পূর্ণ উপযোগী।...প্রথমেই হল, গুরুদেবের সঙ্গীত যার উপর সমস্ত নৃত্যনাট্য প্রতিষ্ঠিত। চিত্রাঙ্গদার এই নূতন রূপ তাঁরই সঙ্গীতকে অবলম্বন করে বিকশিত। কবিতার চিত্রাঙ্গদা সঙ্গীতের মধ্য দিয়ে বেশ পরিবর্তন করেছে মাত্র।"[১] কিন্তু এই রূপান্তর শুধু বেশ পরিবর্তন নয়, কুরূপা চিত্রাঙ্গদার সুরূপা চিত্রাঙ্গদায় পরিবর্তনের মতোই এই পরিবর্তন যেন জন্মান্তর। নৃত্যনাট্যের মহড়া শুরু হবার পরে মহড়ায় যোগদান করে রবীন্দ্রনাথ প্রতিমা দেবীকে লেখেন, "সমস্ত জিনিসটা বেশ দ্রুত এবং সুঠাম হলে ভালো হয়। এ নাটকটি লিরিকালের চেয়ে ড্রামাটিক বেশি।"[২] যেখানে চিত্রাঙ্গদা নাট্যকাব্য লিরিকাল, সেখানে নৃত্যনাট্য ড্রামাটিক—এই পরিবর্তন মৌলিক প্রকৃতিগত পরিবর্তন। 'সুঠাম' হবার প্রয়োজনে মূল রচনার অনেক অসংগতি এবং অপ্রয়োজনীয়তা অপনোদিত হয়েছে নৃত্যনাট্যে। গীতিকবিতা-সুলভ যে ভাববিস্তার নাট্যকাব্যে প্রশ্রয় পেয়েছে, নৃত্য-নাট্যে ড্রামাটিক দ্রুততা এবং অব্যর্থতা অর্জন করতে গিয়ে সেই বিস্তার-প্রবণতা পরিত্যক্ত। যেখানে প্রজাবৎসলা চিত্রাঙ্গদার কল্পনা অর্জুন নাট্যকাব্যে দীর্ঘ পরিসরে করেছিল—

> সিংহিনীর মতো, চারিদিকে আপনার
> বৎসগণে রয়েছেন আগলিয়া, শত্রু
> কেহ কাছে নাহি আসে ডরে। ফিরিছেন
> মুক্তলজ্জা ভয়হীনা প্রসন্নহাসিনী—
> বীর্যসিংহ 'পরে চড়ি জগদ্ধাত্রী দয়া। (৯)

নৃত্যনাট্য সেখানে সুরের সহযোগে একটি মাত্র বাক্যে সেই কল্পনাকে সহজেই রূপায়িত করে—'শুনি সিংহাসনা যেন সে সিংহবাহিনী'। উপমার প্রতি আদর, ধীর-বিস্তার গীতিকবিতা এবং আখ্যানকবিতায় সম্ভব হতে পারে, কিন্তু নাটকে যেখানে ঘটনা এবং আবেগের দ্রুত গতি সেখানে সম্ভব হয় না। সেই কারণে মিশ্র উপমার যে প্রাদুর্ভাব নাটকে দেখা যায়, গীতিকাব্য ও আখ্যানকাব্যে তা দেখা যায় না।[৩] বর্ণনামূলক কাব্যে কাহিনীর ঘটনা অতীতে ঘটেছে বলে বর্ণনা করা হয় কিন্তু যে রচনা ড্রামাটিক সেখানে ঘটনাগুলি বর্তমান থেকে ভবিষ্যৎ কালের দিকে ধাবিত হয়। বর্ণনামূলক কাব্যে যা ঘটে গেছে তার রূপায়ণ, নাটকে যা ঘটছে তারই রূপায়ণ করা হয়। নাট্যকাব্য চিত্রাঙ্গদার সঙ্গে নৃত্যনাট্য চিত্রাঙ্গদার তুলনা করলে সেই কালগত পার্থক্য স্পষ্ট হয়ে ওঠে। বসন্তের 'মোহিনী মায়ার' কথা যা নাট্যকাব্যে

বর্ণিত হয়েছে, নৃত্যনাট্যে তা নৃত্য ও গীতের উচ্ছলতার মাধ্যমে প্রত্যক্ষভাবে উপস্থাপিত। শিকারকালে নিজের প্রেমনিবেদনের যে ব্যর্থতার অতীতকাহিনী চিত্রাঙ্গদা নাট্যকাব্যে নিজের মুখে বলছে, নৃত্যনাট্যে সেই প্রত্যাখ্যান দৃশ্য রঙ্গমঞ্চে উপস্থাপিত। নাট্যকাব্যে যা কিছু অতীতের বিবরণ হিসাবে পেয়েছিলাম, তার আত্মনিবেদনের আগ্রহ, নারীসাজে সজ্জিত হওয়া ('পরিলাম রক্তাম্বর, কঙ্কণ, কিঙ্কিণী, কাঞ্চী'), অর্জুনের প্রত্যাখ্যান ('ব্রহ্মচারী ব্রতধারী আমি। পতিযোগ্য নহি বরাঙ্গনে।') সেই সব এখানে মঞ্চে ঘটনারূপে উপস্থাপিত তার নারীত্বের আত্মপ্রকাশের যে বিবরণ চিত্রাঙ্গদা দিয়েছিল নাট্যকাব্যে মদনের কাছে এখানে নৃত্যনাট্যে সেই আত্মপ্রকাশ দর্শকের সামনে ঘটলো—'ওরে ঝড় নেমে আয়' এই আত্ম-উদ্দীপনার গানে অতীতকে সে বিসর্জন দিল, 'বঁধু, কোন আলো লাগল চোখে' গানে তার নারীত্বের 'লজ্জিত স্মিতমুখ' প্রকাশ পেল। প্রেমোন্মাদনায় মত্ত অর্জুনের অবস্থার বর্ণনা পূর্বরূপে পরোক্ষে পেয়েছিলাম চিত্রাঙ্গদার ভাষণে—

সেই
থরথর ব্যাকুলতা বীরহৃদয়ের,
তৃষার্ত কম্পিত এক স্ফুলিঙ্গনিঃশ্বাসী
হোমাগ্নিশিখার মতো……উত্তপ্ত হৃদয়
ছুটিয়া আসিতে চাহে সর্ব্বাঙ্গ টুটিয়া…(৩)

নৃত্যনাট্যে অর্জুনের সেই অবস্থা দেখি তার নৃত্যে, সেই অবস্থা জানি প্রত্যক্ষভাবে অর্জুনের নিজের মুখের কথায়—

এ কী তৃষ্ণা এ কী দাহ।
এ যে অগ্নিলতা পাকে পাকে
ঘেরিছে তৃষ্ণার্ত কম্পিত প্রাণ।
উত্তপ্ত হৃদয়
ছুটিয়া আসিতে চাহে সর্ব্বাঙ্গ টুটিয়া। (৩)

নাট্যকাব্যের ষষ্ঠ দৃশ্যে যা ছিল অর্জুনের ভ্রাতৃবৃন্দসহ অতীত মৃগয়ার স্মৃতিরোমন্থন তা এখানে চিত্রাঙ্গদার বর্তমান শিকারের আয়োজনে রূপান্তরিত।

নাট্যকাব্য
…অরণ্যেতে ঘনঘোর
ছায়া…
গুরু গুরু মেঘমন্দ্রে
নৃত্য করি উঠিত হৃদয় ; ঝর ঝর
বৃষ্টিজলে, মুখর নির্ঝরকলোল্লাসে
সাবধান পদশব্দ শুনিতে পেত না
মৃগ ; চিত্রব্যাঘ্র পঞ্চনখচিহ্নরেখা
রেখে যেন পঙ্ক পরে, দিয়ে যেত
আপন গৃহের সন্ধান। (৬)

নৃত্যনাট্য
গুরু গুরু গুরু গুরু ঘন মেঘ গরজে পর্ব্বতশিখরে
অরণ্যে তমশ্ছায়া।
মুখর নির্ঝর কলকল্লোলে
ব্যাধের চরণধ্বনি শুনিতে পায় না ভীরু
হরিণদম্পতি।
চিত্রব্যাঘ্র পদনখচিহ্নরেখাশ্রেণী
রেখে গেছে ঐ পথপঙ্ক 'পরে
দিয়ে গেছে পদে পদে গুহার সন্ধান। (১)

এই তুলনামূলক দৃষ্টান্তগুলি থেকেই বোঝা যায় কেন রবীন্দ্রনাথ নৃত্যনাট্য চিত্রাঙ্গদাকে লিরিকাল নয় ড্রামাটিক বলেছিলেন। গঠনের মধ্যে এই যে ড্রামাটিক গুণ এনেছেন, সংগীতের সুর ও লয়ে, শিক্ষিত অঙ্গের সঞ্চালনে ভাব মূর্তি লাভ করায় সেই গুণ আরো প্রগাঢ়ভাবে নাটকীয় হয়ে উঠেছে। নাট্যকাব্যের এগারোটি দৃশ্য সংক্ষিপ্তি ও বাহুল্যবর্জিত দ্রুততা অর্জনের ফলে নৃত্যনাট্যে ছয়টি দৃশ্যে সম্পূর্ণতা লাভ করেছে।

নাট্যকাব্যে সুরূপা চিত্রাঙ্গদাকে অর্জুন আগে দেখেছে, নিজের মধ্যে রূপলাবণ্যের এই অবিশ্বাস্য আবির্ভাব দেখে চিত্রাঙ্গদার বিস্ময়ের বর্ণনা পাই পরে। কিন্তু নৃত্যনাট্যে কালক্রম বিপরীত। নাট্যকাব্যের অনুরূপ ভাষায় চিত্রাঙ্গদা নৃত্যনাট্যে নিজেকে নিয়ে বিস্ময়মুগ্ধতা প্রকাশ করেছে, কথার মধ্যে যে সামান্য পরিবর্তন পাই তা ঘটেছে নৃত্যের প্রয়োজনে গানের সুরে বাঁধা ছন্দ ব্যবহারের দায়ে। 'এ কে এল মোর দেহে পূর্ব-ইতিহাসহারা', চিত্রাঙ্গদার মনে হয়েছে, 'আমি শুধু এক রাত্রে ফোটা অরণ্যের পিতৃমাতৃহীন ফুল'। নাট্যকাব্যে যেখানে সে বলে—

মীনকেতু,
কোন মহারাক্ষসীরে দিয়াছ বাঁধিয়া
অঙ্গসহচরী করি ছায়ার মতন—
কী অভিসম্পাত। (৩)

সেখানে নৃত্যনাট্যে নিম্নোদ্ধৃত রূপান্তর পাই—

মীনকেতু,
কোন্ মহারাক্ষসীরে দিয়াছ বাঁধিয়া অঙ্গসহচরী করি।
এ মায়ালাবণ্য মোর কী অভিসম্পাত। ক্ষণিক যৌবন-বন্যা
রক্তস্রোতে তরঙ্গিয়া উন্মাদ করেছে মোরে। (৩)

নৃত্যনাট্যের এই অংশটি সুরহীন আবৃত্তির জন্য লিখিত এবং আবৃত্তির সঙ্গে এইস্থানে নৃত্যে অভিনয় হয়। 'কী অভিসম্পাত!' কথায় যে আবৃত্তিকালে ঝোঁক পড়ে, নর্তকীর পদক্ষেপের আঘাত সেই ঝোঁকের বেদনা ও উন্মাদনাকে অপরূপ মাধুর্য-যাতনা দেয়।

হে অনঙ্গদেব, এ কী রূপ হুতাশনে
ঘিরেছে আমারে, দগ্ধ করে
মারি। (৩)

এই ভাব প্রকাশ পেয়েছে নৃত্যনাট্যে 'স্বপ্নমদির নেশায় মেশা' গান ও তার অনুযাত্র নৃত্যের চরম উন্মাদনায়। নাট্যকাব্যে অর্জুন সুরূপা চিত্রাঙ্গদাকে দেখে বিস্মিত হয়ে নিজেকে বলেছিল, 'কাহাকে হেরিনু? সে কি সত্য কিংবা মায়া?' সেই উচ্চারিত বিস্ময় নৃত্যনাট্যে সুর ও নৃত্যের দাবিতে হয়েছে—

কাহারে হেরিলাম! আহা!
সে কি সত্য, সে কি মায়া,
সে কি সুবর্ণকিরণে-রঞ্জিত ছায়া। (৩)

এই ভাষা এবং সুর শোনা মাত্র আমাদের মনে পড়ে যায় মায়ার খেলার কথা—

একি স্বপ্ন! এ কি মায়া!
এ কি প্রমদা! এ কি প্রমদার ছায়া। (৭)

চিত্রাঙ্গদা নৃত্যনাট্যের 'এসো এসো বসন্ত, ধরাতলে' গানেরও পূর্বরূপ মেলে মায়ার খেলা গীতিনাট্যের সপ্তম দৃশ্যে।

সুর ও নৃত্যের প্রয়োজনে বাগ্‌বিন্যাসের রূপান্তরের কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে।

নাট্যকাব্য

কুৎসিত কুরূপ। এমন বঙ্কিম ভুরু
নাই তার—এমন নিবিড়কৃষ্ণ তারা···(৯)

নৃত্যনাট্য

ছি ছি কুৎসিত কুরূপ্ সে।
হেন বঙ্কিম ভুরুযুগ নাহি তার
হেন উজ্জ্বল কজ্জল আঁখিতারা। (৪)

সুরের স্মৃতি মনে রেখে মুক্তক ছন্দের কবিতার মতো নৃত্যনাট্যের উদ্ধৃত অংশটি পাঠ করলে 'ছি ছি' অব্যয়ের ধিক্কারের মধ্যে, 'উজ্জ্বল কজ্জল' এই নবাগত শব্দদ্বয়ের যুক্তাক্ষরের মধ্যে সংগীতের দ্রুত লয়, নর্তকীর নূপুরভূষিত পায়ের তালের আঘাত-শব্দ যেন শুনতে পাব। তখনই বোঝা যাবে নৃত্যের প্রয়োজনে, এবং নৃত্যের উপযুক্ত সংগীতের সুরের দাবীতে কথার এই পরিবর্তন। দুই রূপে চিত্রাঙ্গদার সর্বশেষ উক্তিটি এই প্রসঙ্গে তুলনীয়।

নাট্যকাব্য

আমি চিত্রাঙ্গদা। রাজেন্দ্রনন্দিনী।.....
দেবী নহি, নহি আমি সামান্যা রমণী।
পূজা করি রাখিবে মাথায়, সেও আমি
নই, অবহেলা করি পুষিয়া রাখিবে
পিছে, সেও আমি নহি। যদি পার্শ্বে রাখ
মোরে সংকটের পথে ··যদি অনুমতি কর
কঠিন ব্রতের তব সহায় হইতে,
যদি সুখে দুঃখে মোরে কর সহচরী
আমার পাইবে তবে পরিচয়···
আজ
শুধু নিবেদি চরণে, আমি চিত্রাঙ্গদা
রাজেন্দ্রনন্দিনী। (১১)

নৃত্যনাট্য

আমি চিত্রাঙ্গদা, আমি রাজেন্দ্রনন্দিনী।
নহি দেবী, নহি সামান্যা নারী।
পূজা করি মোরে রাখিবে ঊর্ধ্বে সে নহি নহি
হেলা করি মোরে রাখিবে পিছে সে নহি নহি।
যদি পার্শ্বে রাখ মোরে সংকটে সম্পদে,
সম্মতি দাও যদি কঠিন ব্রতে সহায় হতে
পাবে তবে তুমি চিনিতে মোরে।
আজ শুধু করি নিবেদন—
আমি চিত্রাঙ্গদা রাজেন্দ্রনন্দিনী। (৬)

নাট্যকাব্যের অমিত্রাক্ষর ছন্দে সুর যোজনা করায় কথার পুনর্বিন্যাস করতে হয়েছে নৃত্যনাট্যে—সুরের ও নৃত্যের তালের প্রয়োজনে বারংবার ব্যবহৃত 'নহি'-র সংখ্যাবৃদ্ধি হয়েছে ; 'নহি নহি'-র পৌনঃপুন্য ও রাখা-ধাতুর বারংবার ব্যবহারের ফলে মূলের মিলের অভাব নৃত্যনাট্যের ভাষান্তরে অনুভূত হয় না। আর লক্ষণীয় সুরের প্রয়োজনে যুক্তাক্ষর সমন্বিত নূতন শব্দের আগমন অথবা মূলের অযুক্তাক্ষর শব্দের পরিবর্তে সমার্থক যুক্তাক্ষর-সমন্বিত শব্দের ব্যবহার। সুর যেমন যুগ্মধ্বনিকে শোষণ করেছে, তেমনি কথার যুগ্মধ্বনি সুরকে একপ্রকার মহিমা দিয়েছে।

এই গঠনগত ও ভাষাগত রূপান্তরের ফলে নাট্যকাব্যে নায়িকার যে অন্তর্চিন্তা ও মানসিক অভিক্ষেপ ছিল তা আরো চমৎকার অভিব্যক্তি পেয়েছে নৃত্যনাট্যে। চিত্রাঙ্গদার দৈহিক রূপান্তরের সঙ্গে সঙ্গে যে বিপুল মানসিক রূপান্তর তার পূর্ণ প্রকাশ যেন নাট্যকাব্যে হয় নি, নৃত্যনাট্যে সেই মনোভাব পরিবর্তনের পূর্ণতর প্রকাশ হয়েছে এতে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু নাট্যকাব্যে যে কামের তাপ ছিল, পরিণত বার্ধক্যে রূপান্তর সাধনের জন্যই হোক বা অন্য যে কোনো কারণেই হোক নৃত্যনাট্যে কামের সেই উত্তাপ অনুপস্থিত। রভসলালসায় অর্জ্জুনের দৃষ্টি যখন দশ অঙ্গুলির মতো চিত্রাঙ্গদার নিদ্রালস তনু স্পর্শ করেছিল, যখন দুই বাহু চিত্রাঙ্গদা বাড়িয়ে দিয়েছিল মিথ্যা শরমসংকোচ ত্যাগ করে, অসহ্য পুলকে যখন স্বর্গমর্ত্য দেশকাল সুখদুঃখ জীবনমরণ বিস্মৃত হয়েছিল তখনকার বর্ণনায় যে কামের তীব্র তাপ তা নৃত্যনাট্যে নেই। অতীত ঘটনার স্মৃতিরোমন্থনকালে যে কথা বলা যায়, প্রত্যক্ষভাবে রঙ্গমঞ্চে তার রূপায়ণ করতে রবীন্দ্রনাথ অস্বস্তি বোধ করেছিলেন বলে বোধহয় এই কামতপ্ত অবস্থার উপস্থাপনা করা হয় নি।[৪]

চিত্রাঙ্গদা নৃত্যনাট্যে রবীন্দ্রনাথ সুঠাম দ্রুততা তথা ড্রামাটিক গুণের সন্ধানী হওয়া সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথ চিত্রাঙ্গদা নৃত্যনাট্য রচনার ক্ষেত্রে যে পদক্ষেপ দিয়েছেন তা পরীক্ষামূলক। ফলে নৃত্যনাট্যের অনেক সমস্যার সমাধান তিনি করে উঠতে পারেন নি। এর পূর্ব্বে রবীন্দ্রনাথ কবিতা ও নাট্যকাব্যের আবৃত্তির সঙ্গে নৃত্যাভিনয়ের যে পরীক্ষা করেছিলেন সে সম্বন্ধে পূর্বে বলেছি। সেই পরীক্ষানিরীক্ষার কিছু চিহ্ন রয়ে গেছে চিত্রাঙ্গদা নৃত্যনাট্যেও। চিত্রাঙ্গদায় সমস্ত সংলাপ, পাত্রপাত্রীর ভাবপ্রকাশের বাণী এখনো সুরের দ্বারা আক্রান্ত হয় নি, কিছু কিছু অংশ রয়ে গেছে যেখানে সুরহীন আবৃত্তির সঙ্গে নৃত্যাভিনয় করতে হয়। নিজের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে শান্তিদেব বলেন, "আবৃত্তির ছন্দ ও গানের ছন্দ যে এক নিয়মে চলে না তা সকলেই জানেন, কিন্তু আবৃত্তির ছন্দে অভিনয় করা যে ভালো নাচিয়েদের পক্ষে সম্ভব এ আমি নিশ্চয় করে বলতে পারি।"[৫] গানের মতোই কবিতার আবৃত্তির সঙ্গে নাচা যায় এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু এ কথা ঠিক যে, সুরময় গানের সঙ্গে নাচ হতে হতে হঠাৎ সুরহীন বাণীর সঙ্গে নাচ হলে, সুরস্রোতের পর সুরাভাবে যেন একটি স্তর-পরিবর্তনের অনুভূতি হয়। এই সুরহীন সংলাপগুলির কথা প্রতিমা দেবীও উল্লেখ করেছেন, "চিত্রাঙ্গদার আর একটি বিশেষ জিনিস হলো ছোটো ছোটো কবিতাগুলি, তারা মাঝে মাঝে সূত্র ধরিয়ে দিয়েছে মূল ঘটনার, গান ও নাচ বন্ধ করে দর্শকচিত্তকে বিশ্রাম দেওয়ার সঙ্গে নাটকের ঘটনাসূত্রের যোগ রাখাই হলো তাদের কাজ ; এই কবিতাগুলির ছন্দ দেহের নৃত্যলীলাকে বাঁচিয়ে রাখে। পরবর্তী নৃত্য যে আবার সেই ভঙ্গীর মধ্যে সাড়া দিয়ে উঠবে এ যেন তারই ভূমিকা।"[৬] কবিতাগুলির সমর্থনে প্রতিমা দেবীর এই বক্তব্যকে মেনে নেওয়া যায় না। কারণ, প্রথমত, এই কবিতাগুলির ছন্দ যেহেতু দেহের নৃত্যলীলাকে বাঁচিয়ে রাখে সেজন্য দর্শকচিত্ত গান থেকে বিশ্রাম পেলেও নাচ থেকে বিশ্রাম পায় না ; দ্বিতীয়ত, দর্শকচিত্তকে গান থেকে বিশ্রাম দেবার জন্য, মূল ঘটনার সূত্র ধরাবার জন্য এবং পরবর্তী নৃত্যের ভূমিকা প্রস্তুত করার জন্য যখন এই জাতীয় আবৃত্তির প্রয়োজন চণ্ডালিকা ও শ্যামা নৃত্যনাট্যে দেখা যায় না, তখন বোঝা যায় এই কবিতাগুলির কোনো অনিবার্য শিল্পগত প্রয়োজন ছিল না। একদিকে কবিতা বা নাট্যকাব্যের আবৃত্তির সঙ্গে নৃত্যাভিনয়, ও অন্যদিকে শ্যামা-চণ্ডালিকার চূড়ান্ত সার্থকতার মধ্যে চিত্রাঙ্গদা দণ্ডায়মান বলে পূর্ববর্তী পর্যায়ের আবৃত্তির সঙ্গে নৃত্যাভিনয়ের পরীক্ষার ইতিহাস এই সুরহীন আবৃত্তিগুলির মধ্যে রয়ে গেছে। এই অংশগুলি রবীন্দ্রনৃত্যনাট্যের বিবর্তন ইতিহাসের দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

ঈপ্সিত নাট্যীয় দ্রুততা আরো একটি কারণে ব্যাহত হয়েছে। এই ব্যাঘাতের নেপথ্যকারণ শান্তিদেবের গ্রন্থ থেকে জানা যায়।[৭] রঙ্গমঞ্চে অভিনয়ের সময় বাড়ানোর জন্য রবীন্দ্রনাথ নানাস্থানে গান জুড়েছেন। সাজবদলের জন্য সময় দরকার, তখনও গান বসিয়েছেন। তাছাড়া চিত্রাঙ্গদায় এমন কতকগুলি গানের সঙ্গে নাচ আছে, যেগুলি বহু পূর্ব্ব থেকেই শান্তিনিকেতনে ভালো নাচ বলে পরিচিত ছিল। যেমন 'সেদিন দুজনে দুলেছিনু বনে' রূপান্তরিত হয়ে চিত্রাঙ্গদায় হয়েছে 'কেটেছে একেলা বিরহের বেলা'। কেবলমাত্র ভালো নাচ বলে চিত্রাঙ্গদায় যখন সেগুলি রাখার প্রস্তাব হয় তখন রবীন্দ্রনাথ তাতে আপত্তি করেন নি, শুধু ভাবসাম্যের প্রয়োজনে যেখানে দরকার কথা বদলে দিয়েছেন। কখনও কখনও কথার বদল না করে গানটি কি উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত মুদ্রিত পুস্তকে গানের মাথায় সে কথা উল্লেখ করে দিয়েছেন। চিত্রাঙ্গদায় এই জাতীয় কয়েকটি গান আছে। চণ্ডালিকা ও শ্যামায় এই জাতীয় বাহ্যিক প্রয়োজন নৃত্যনাট্যগুলির নাট্যোদ্দেশ্যকে বিভ্রান্ত ও ক্ষতিগ্রস্ত করে নি। এই বাহ্যিক প্রয়োজনের বশে এবং নৃত্যনাট্যের পরীক্ষায় এখনো সম্পূর্ণ সার্থকতা লাভ না করায় দেখি চিত্রাঙ্গদায় সুরময় সংগীত-সংলাপের তুলনায় স্বয়ংসম্পূর্ণ গান, যেগুলি নাটক থেকে বিচ্ছিন্ন করে স্বতন্ত্রভাবে গাওয়া যায়, এমন গানের সংখ্যা বেশী। এতো বেশী যে, মনে হয় গানের সুরে নাটকীয় সংলাপ রচনা যে সম্ভব এই কথা তিনি যে বাল্মীকিপ্রতিভা ও কালমৃগয়ার যুগে জেনে গিয়েছিলেন, সেই অভিজ্ঞতা যেন চিত্রাঙ্গদায় ব্যবহার করতে রবীন্দ্রনাথ ভুলে গেছেন। চিত্রাঙ্গদায় স্বয়ংসম্পূর্ণ গানের সংখ্যা এত বেশী যে, মায়ার খেলা গীতিনাট্য সম্বন্ধে যে কথা রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন—নাট্যের সূত্রে গানের মালা– সেই কথা চিত্রাঙ্গদা সম্বন্ধেও অনেকাংশে খাটে। ফলে মায়ার খেলায় যেমন নাট্যগুণ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল, ঐ পরিমাণে না হলেও চিত্রাঙ্গদাতেও নাট্যগুণ কিছু ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এই কারণে "কল্পনা-কৈবল্যের জন্যই চিত্রাঙ্গদা নৃত্যনাট্য একটি শ্রেষ্ঠ কীর্তি,"[৮] ধূর্জটিপ্রসাদের এই উক্তি পুরোপুরি সমর্থন করা যায় না।

(খ) চণ্ডালিকা

চণ্ডালিকা নৃত্যনাট্যের প্রথম দৃশ্যের প্রথমাংশ, যেখানে অস্পৃশ্যা প্রকৃতি ফুলওয়ালি, দইওয়ালা ও চুড়িবিক্রেতার দ্বারা অবজ্ঞাত ও প্রত্যাখ্যাত হচ্ছে, তার কোন বীজ চণ্ডালিকার গদ্যনাট্যরূপে ছিল না। এই অংশটি রবীন্দ্রনাথ পঞ্চাশ বছরের অধিককালের ব্যবধানে

প্রকৃতির প্রতিশোধ নাটক থেকে রূপান্তরিত করে চণ্ডালিকা নৃত্যনাট্যে গ্রহণ করেছেন। প্রকৃতির প্রতিশোধের তৃতীয় দৃশ্যে রঘুর দুহিতা প্রবেশ করলে প্রথম পথিক পান্থজনকে সাবধান করে দিয়েছে—

পান্থগণ, সরে যাও। হেরো, আসিতেছে
ধর্মভ্রষ্ট অনাচারী রঘুর দুহিতা। (৩)

সে বলেছে, 'ছুঁসনে ছুঁসনে মোরে—', দ্বিতীয় পথিক বলেছে, 'সরে যা অশুচি।' জনৈকা বৃদ্ধা তাকে অস্পৃশ্যা না জেনে তাকে করুণা করলে পথিকগণ বৃদ্ধাকে বলেছে—

ছুঁয়ো না ছুঁয়ো না ওরে—
কে গো তুমি, জান নাকি অনাচারী রঘু,
তাহারি দুহিতা ও যে! (৩)

বৃদ্ধাও তখন 'ছি ছি ছি কি ঘৃণা' বলে প্রস্থান করেছে। চণ্ডালিকা নৃত্যনাট্যে এরই রূপান্তর পাই যখন ফুলওয়ালির দল তাকে ঘৃণা করে চলে যায়, যখন মেয়ের দল দইওয়ালা চুড়িওয়ালাকে সাবধান করে বলে—

ওকে ছুঁয়ো না ছুঁয়ো না, ছি,
ও যে চণ্ডালিনীর ঝি—
নষ্ট হবে যে দই সে কথা জানো না কি। (১)

এই নিকট-সাদৃশ্যের ফলেও যদি একটি অপরটির রূপান্তর একথা বিশ্বাসযোগ্য না হয়, তাহলে স্মরণ করানো যেতে পারে যে প্রকৃতির প্রতিশোধে সন্ন্যাসীর উপরে প্রকৃতি প্রতিশোধ নিয়েছিল, চণ্ডালিকায় আনন্দকে যে মেয়ে ভালোবেসেছে তারও নাম প্রকৃতি। সন্ন্যাসীর কাছে সসংকোচে রঘুর দুহিতা নিজের পরিচয় দিয়েছিল 'অনার্যা অশুচি আমি' বলে এবং সন্ন্যাসী তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেছিল অনার্যা অশুচিই সংসারের ধূলি শুচি করেছে; চণ্ডালিকায় প্রকৃতি পিপাসার্ত আনন্দকে বলেছিল 'আমি চণ্ডালের কন্যা, মোর কূপের বারি অশুচি', এবং আনন্দ সেই জল তীর্থবারি বলে পান করেছিল। কোন কোন বাক্যাংশগত সাদৃশ্যও মনে করিয়ে দেয় চণ্ডালিকা নৃত্যনাট্য রচনাকালে কবির মনে প্রকৃতির প্রতিশোধের কথা বিশেষভাবে বর্তমান ছিল। প্রকৃতির প্রতিশোধের সন্ন্যাসীর সন্ন্যাস-সাধনা যখন শুষ্ক তখন তার আন্তরিক অবস্থা বাইরে প্রতিফলিত।

মধ্যাহ্ন আইল, অতি তীক্ষ্ণ রবিকর।
শূন্য যেন তপ্ত তাম্র-কটাহের মতো।
ঝাঁ ঝাঁ করে চারিদিক; তপ্ত বায়ুভরে
থেকে থেকে ঘুরে ঘুরে উড়িছে বালুকা। (২)

এই অবস্থায় রঘুর বালিকার সঙ্গে পথপার্শ্বে দেখা হওয়ায় সন্ন্যাসীর শূন্য জীবন পূর্ণ হয়েছিল। চণ্ডালিকা নৃত্যনাট্যে প্রকৃতির জীবনের শুষ্কতা বিম্বিত হয়েছে দগ্ধ তপ্ত বহিঃপৃথিবীতে।

সেদিন বাজল দুপুরের ঘণ্টা, ঝাঁ ঝাঁ করে রোদ্দুর,
স্নান করাতেছিলাম কুয়োতলায় মা-মরা বাছুরটিকে···(২)

এমন সময় 'সামনে এসে দাঁড়ালেন বৌদ্ধ ভিক্ষু আমার' এবং তার 'দগ্ধ কাননের' জীবন তাই বাঁচবার অর্থ খুঁজে পেল। এই সব কারণে বলা যায় চণ্ডালিকা নৃত্যনাট্যের প্রথম দৃশ্যের প্রথমাংশ প্রকৃতির প্রতিশোধ নাটকের তৃতীয় দৃশ্যের ভিত্তিতে মোটের উপর লিখিত।

১৯৩৩ সালে রবীন্দ্রনাথের চণ্ডালিকা গদ্যনাট্য প্রকাশিত হয়। নৃত্যনাট্যে তাকে রূপান্তরিত করা হয় ১৯৩৮ সালে। ১৯৩২-এর জুলাই মাসে রবীন্দ্রনাথ জলপাত্র বলে একটি কবিতা লেখেন, বর্তমানে ঐ কবিতাটি পরিশেষ গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে। এই কবিতাটিতেও চণ্ডালিকা নৃত্যনাট্যের প্রথম দৃশ্যের পূর্বাভাস পাওয়া যায়। গদ্যনাট্য চণ্ডালিকায় প্রকৃতি মাকে বলেছে কি করে আনন্দের আগমনে ও আচরণে তার জীবনধারা পরিবর্তিত হলো, তার অস্পৃশ্যতার গ্লানি ঘুচে গেল সেই অতীতকাহিনী। নৃত্যনাট্যে সেই দৃশ্য নায়িকার উক্তির মাধ্যমে পরোক্ষবর্ণিত না হয়ে, রঙ্গমঞ্চে পৃথকভাবে উপস্থিত হয়েছে। জলপাত্র কবিতাটির বিষয়বস্তুও সেই একই ঘটনা। 'মাঠের পথের বাঁকে বাঁকে তীব্র দ্বিপ্রহরে' অন্ত্যজ রমণী আসছিল জল নিয়ে, প্রভু তৃষ্ণার জল চাইতে সে পরিচয় দিয়েছে 'হীন নারী' বলে এবং প্রণাম করে বলেছে 'অপরাধী করিয়ো না মোরে।' তখন 'জলভরা মেঘস্বরে' সেই প্রভু শতদল পঙ্কজের যেমন জাতি নেই, তেমনি তারও জাতি নেই, 'পুণ্য যথা মৃত্তিকার এই বসুন্ধরা' সেই মতো সেও পুণ্যনারী বলে আশীর্বাদ করে গেল। তারপর থেকে সেই ভাগ্যবতী

রমণী জলপাত্র চিত্রিত করে প্রভুকে সৌন্দর্যের নিবেদন দেবার জন্য। প্রকৃতির প্রতিশোধের সন্ন্যাসী বলেছিল অশুচিই সংসারের ধূলিকে শুচি করেছে, জলপাত্র কবিতায় প্রভু বলেছে মৃত্তিকার বসুন্ধরার মতোই এই অস্পৃশ্যা রমণী পুণ্যবতী. 'সব জলই তীর্থজল যা তাপিতকে স্নিগ্ধ করে', গদ্যনাট্যে আনন্দ বলেছিল, এবং নৃত্যনাট্যে আনন্দ প্রকৃতিকে সহসা দিয়েছিল মানুষের তৃষ্ণা মেটানো সম্মান। বোঝা যায়, জলপাত্র রচনার সময় থেকে রবীন্দ্রনাথের মন চণ্ডালিকার বিষয় নিয়ে ভাবিত ছিল, সেই ভাবনার চিহ্ন রয়ে গেছে এই ক্ষুদ্র কবিতাটিতে।

শ্রীমতী ঠাকুর ও নন্দিতা দেবীর সাহায্যে রবীন্দ্রনাথ এক সময় গদ্যনাট্য চণ্ডালিকাকে নৃত্যে ও কথায় অভিনয় করাবেন মনস্থ করেন। ভেবেছিলেন গদ্যসংলাপের অংশগুলি তিনি পাঠ করবেন এবং সংগীত অংশগুলি ঐ দুইজন নৃত্যে অভিনয় করবেন।* পূজারিণীর মূকাভিনয়ের পরিকল্পনা দেখে তিনি যখন নটীর পূজা লেখেন এবং নটীর পূজায় যখন গানের অংশগুলি নৃত্যে অভিনীত হয় তখন সেই অভিজ্ঞতায় উৎসাহিত হয়ে রবীন্দ্রনাথ এই কাজে উদ্যোগী হয়েছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সেইভাবে নাটকটির অভিনয় হয় নি। গদ্যনাট্য রচনার মাত্র পাঁচ বছর পরে রবীন্দ্রনাথ তাকে নৃত্যনাট্যে রূপান্তরিত করলেন। চিত্রাঙ্গদা নাট্যকাব্যের নৃত্যনাট্যে রূপান্তর দীর্ঘকালের ব্যবধানে করা হয়েছিল, সেই কারণে তার মধ্যে ভাষাগত ভাবগত ও চরিত্রগত যে বিপুল পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়, চণ্ডালিকার রূপান্তরে তা দেখা যায় না। প্রথমত চণ্ডালিকা গদ্যনাট্যটি পরিণত বয়সের রচনা বলে এবং দুই রূপের মধ্যে ব্যবধান সামান্য কালের বলে চণ্ডালিকার দুই রূপে ভাবভাষা ও চরিত্রগত মৌলিক পার্থক্য নেই।

চিত্রাঙ্গদা নৃত্যনাট্যের সঙ্গে চণ্ডালিকা নৃত্যনাট্যের তুলনা করলে রবীন্দ্রনাথ যে চণ্ডালিকায় নৃত্যনাট্য রচনার ব্যাপারে আত্ম-প্রত্যয়ের সঙ্গে আরো এক পদক্ষেপ এগিয়েছেন তা বোঝা যাবে। চিত্রাঙ্গদায় সুরহীন আবৃত্তির সঙ্গে নাচ থাকায় যে স্তরচ্যুতির, দ্বিধা-গ্রস্ততার দুর্বলতা ছিল, চণ্ডালিকায় সেই দুর্বলতা নেই, কারণ এখানে সুরহীন আবৃত্তি সহযোগে নাচ অনুপস্থিত। সমস্ত সংলাপই এখানে সুরময় গান, সমস্তই নৃত্যই এখানে সুরময় সংলাপের ভিত্তিতে পরিকল্পিত। তা ছাড়া চিত্রাঙ্গদায় উত্তর-প্রত্যুত্তরে দ্রুত সংলাপের তুলনায় অখণ্ড স্বয়ংসম্পূর্ণ গানের যে আধিক্য ছিল নৃত্যনাট্য চণ্ডালিকায় তা নেই। এখানে অখণ্ড গানের সংখ্যা মুষ্টিমেয়, সুরময় সংলাপের বিন্যাসের ভিত্তিতে নৃত্যনাট্যটি গড়ে উঠেছে। চিত্রাঙ্গদার যেমন পূর্ব্বের প্রচলিত নৃত্যগুলি যোগের প্রয়োজনে ও নৃত্যনাট্যটিকে সালং-কারা করার প্রয়োজনে গানের পর গান, নাচের পর নাচ যুক্ত হয়েছিল, অনেকে চণ্ডালিকাকেও তেমনি নৃত্যে গানে ঐশ্বর্যময় করার প্রস্তাব করেছিলেন। সেই প্রস্তাব অগ্রাহ্য করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ এবং জানিয়েছিলেন, "বাহুল্য নাচগান বর্জন করা দরকার বোধ হলো। সেগুলি স্বতন্ত্র আকারে যতই ভালো হোক, সমগ্রভাবে বাধাজনক।"[১০] চণ্ডালিকার সময়ে রবীন্দ্রনাথ, বাল্মীকিপ্রতিভা-কালমৃগয়ার যুগে গানের মধ্য দিয়ে যেমন পাত্রপাত্রীর উত্তর-প্রত্যুত্তর সাজিয়েছিলেন, তেমনি গানের সুরের মধ্যে কথোপকথনকে রূপ দিলেন। চিত্রাঙ্গদা ছিল এক দিক থেকে নাট্যের সূত্রে নাচগানের মালা, চণ্ডালিকা হলো নাচগানের সূত্রে নাট্যের মালা। ফলে যে সুঠাম দ্রুততা তথা নাটকীয়তা রবীন্দ্রনাথ চিত্রাঙ্গদায় আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন, সেই আদর্শ পালনে তিনি সফল হলেন চণ্ডালিকায়। কথোপকথনের অন্তর্নিহিত ভাবের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে সুর যোজনা করা হলো এবং সেই ভাব ও সুরের সঙ্গে সাম্য রেখে নৃত্য পরিকল্পিত হলো, তাই "চণ্ডালিকার কথোপকথনের ছন্দের মধ্যে সুরের সেই কারুকার্য মনকে টানে।...নানা প্রকারের সুর কথার অনুসরণে প্রতিপদে পরিবর্তিত হয়েছে।...বিচিত্র সুরসমাবেশের জোরে কথোপকথনের ছন্দ সচল ও জোরালো হয়ে উঠেছে, তালও প্রথাগত নিয়ম থেকে মুক্তি পেয়ে নিজের আবেগকে অবাধে প্রকাশ করেছে।"[১১]

চিত্রাঙ্গদার তুলনায় নৃত্যনাট্য চণ্ডালিকায় অগ্রগতি ঘটেছে আরো এক দিক থেকে। চিত্রাঙ্গদার নৃত্যনাট্যরূপান্তর কালে রবীন্দ্র-নাথ ছন্দোবদ্ধ নাট্যকাব্যে সুর যোজনা করেছিলেন এবং সুরযোজনার প্রয়োজনে তার ভাষাবিন্যাসকে কিছু পরিবর্তিত করেছিলেন। কিন্তু দুঃসাহসী রবীন্দ্রনাথকে চণ্ডালিকা গদ্য-নাট্যকে নৃত্যনাট্যে রূপান্তরকালে গদ্যে সুর দিতে হয়েছে—এ এক অসমসাহসী পদক্ষেপ। গদ্যকেও সুরের সাহায্যে গানে পরিণত করা যায় এই সম্ভাবনার কথা রবীন্দ্রনাথ কিছুকাল আগে থেকে চিন্তা করেছিলেন। 'সুরাশ্রয়ী কবিতার বন্ধনমুক্তিতে কবির পরীক্ষা ফুরায় নাই,' এই মন্তব্য করে গীতবিতানের সম্পাদক মহাশয় দেখিয়েছেন অন্তর্লীন অনুপ্রাসের মাধুর্য থাকায় অনেক গানে তিনি যে অন্ত্যানুপ্রাস বর্জন করেছেন তা বোঝা যায় না।[১২] 'বেদনা কী ভাষায় রে' বা 'বাজে করুণ সুরে', যে গান হিন্দি বা অন্য প্রাদেশিক গানের সুরে রচিত সেগুলিতে শুধু নয়, 'মন মোর মেঘের সঙ্গী' জাতীয় গানে তিনি মধ্যানুপ্রাসের জোরে গানের প্রচলিত অন্ত্যানুপ্রাস বর্জন করেছেন। শুধু অন্ত্যানুপ্রাস বর্জন নয়, বিশুদ্ধ গদ্যে সুরযোজনার দ্বারা তাকে গানে রূপান্তরের কথাও রবীন্দ্রনাথ বেশ কিছুকাল পূর্ব থেকে চিন্তা যে করছিলেন তারও প্রমাণ আছে। চণ্ডালিকার আট বছর পূর্ব্বে তিনি লিখেছেন.

"গদ্যরচনায় আত্মশক্তির সুতরাং আত্মপ্রকাশের ক্ষেত্র খুবই প্রশস্ত। হয়তো ভাবীকালে সংগীতটাও বন্ধনহীন গদ্যের গূঢ়তর বন্ধনকে আশ্রয় করবে। কখনও কখনও গদ্যরচনায় সুর সংযোগ করবার ইচ্ছা হয়। লিপিকা কি গানে গাওয়া যায় না ভাবছ।"[১৩] গ্রন্থপরিচয় থেকে জানা যায় শাপমোচনের বিভিন্ন অভিনয় উপলক্ষে নিম্নলিখিত কথা-অংশগুলিতেও সুর দেওয়া হয়েছিল।[১৪]

রাজা ॥ অসুন্দরের পরম বেদনায় সুন্দরের আহ্বান। সূর্যরশ্মি কালো মেঘের ললাটে পরায় ইন্দ্রধনু, তার লজ্জাকে সান্ত্বনা দেবার তরে। মর্ত্যের অভিশাপে স্বর্গের করুণা যখন নামে তখনি তো সুন্দরের আবির্ভাব। প্রিয়তমে, সেই করুণাই কি তোমার হৃদয়কে কাল মধুর করে নি।

রাজা ॥ একদিন সইতে পারবে, সইতে পারবে, তোমার আপনার দাক্ষিণ্যে, রসের দাক্ষিণ্যে।

রাণী ॥ তোমার একী অনুকম্পা অসুন্দরের তরে, তাহার অর্থ বুঝি নে। ওই শোনো, ওই শোনো, উষার কোকিল ডাকে অন্ধকারের মধ্যে, তারে আলোর পরশ লাগে। তেমনি তোমার হোক-না প্রকাশ আমার দিনের মাঝে, আজি সূর্যোদয়ের কালে।

চণ্ডালিকা গদ্যনাট্যে সুরযোজনার দ্বারা নৃত্যনাট্যে রূপান্তরে সাফল্যলাভের পর দেখি রবীন্দ্রনাথ সেই অভিজ্ঞতায় বলীয়ান হয়ে গদ্যে সুর দিয়ে তাকে গানের মর্যাদা দিচ্ছেন। ১৩৪৭ বঙ্গাব্দের ভাদ্র মাসে রচিত 'আজি কোন্ সুরে বাঁধিব দিন-অবসান-বেলারে' এইরূপ একটি গান। ভাবীকালের অপেক্ষায় না থেকে সংগীত কী ভাবে 'বন্ধনহীন গদ্যের গূঢ়তর বন্ধনকে আশ্রয়' করে রূপ নিতে পারে তাই রবীন্দ্রনাথ চণ্ডালিকা নৃত্যনাট্যে দেখিয়ে দিলেন। বিস্ময় এই যে, লিপিকাকে গানে পরিণত করলে যা হতো রবীন্দ্রনাথ চণ্ডালিকায় তার চেয়েও এক পদক্ষেপ এগিয়ে গেলেন। অখণ্ড গান রচনায় সার্থকতার পরেই সংলাপকে গানে পরিণত করার কাজে হাত দেওয়া যায়; গদ্যগান লেখার চর্চার পর তাই গদ্যগান-সংলাপ রচনায় হস্তক্ষেপ প্রত্যাশিত হতো। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ লিপিকায় সুর দিয়ে তাকে গদ্যগানে রূপান্তরিত না করেই, অখণ্ড গদ্যগান রচনার উল্লেখযোগ্য চর্চা না করেই একেবারে গদ্যনাট্য চণ্ডালিকায় সুর দিলেন, ফলে গদ্যগান শুধু হলো না, তাকে সংলাপের বাহন হতে হলো। গদ্যে সুর যোগ করে গীতধর্ম ও নাট্যধর্ম একই সঙ্গে আনলেন, এ এক বিস্ময়কর কৃতিত্ব।

গদ্যকে সুরময় সংলাপ-গানে পরিণত করতে গিয়ে সুরের প্রয়োজনে কথার বিন্যাস পরিবর্তন করতে হয়েছে। যদিও কথার ভিত্তিই প্রাথমিক তথাপি কথার সঙ্গে সুরের যোজনা হওয়ায় সুর-প্রভাবে মূলভাব অক্ষুণ্ণ রেখে ভাষাগত পরিবর্তন অনিবার্য হয়েছে। নিম্নোদ্ধৃত উদাহরণগুলি পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে সুরের প্রয়োজনে যখন মূল রচনার শব্দগত পরিবর্তন করতে হয়েছে তখন অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেশজ বা লোকপ্রচলিত শব্দের পরিবর্তে এসেছে তদ্ভব বা তৎসম শব্দ সুরের সঙ্গে ধ্বনিগত সামঞ্জস্য বিধানের প্রয়োজনে—'পুড়ে'-র পরিবর্তে 'জ্বলনে', 'মিথ্যে'-র পরিবর্তে 'মিথ্যা', 'নিন্দে' স্থানে 'নিন্দা' এবং 'আয়না' 'ঝড়' এবং 'বুক'-এর পরিবর্তে 'দর্পণ' 'ঝঞ্ঝা' 'বক্ষ'। গদ্যনাট্যে যে তীব্র অনুভূতি ও আবেগ-প্রাবল্য গদ্যভাষায় নিতান্ত আকুল হয়ে উঠতে পারে নি, নৃত্যনাট্যে সেই আবেগ-ব্যাকুলতা শুধু নৃত্যভঙ্গিমায় ব্যাকুল হয়ে ওঠে নি, সুরগত প্রয়োজনে সেই তীব্রানুভূতি ও আবেগ কথাগুলির পৌনঃপুন্যের সাহায্যে মুখরিত হয়ে উঠেছে। এই পৌনঃপুন্য একদিকে গানের ধুয়ার কাজ করেছে, নৃত্যভঙ্গিমা গান ও কথার সাহায্যে অনুভূতির মর্মান্তিকতাকে অন্যদিকে প্রকাশ করেছে। গদ্যনাট্যে মা বলেছেন, 'প্রভু, অসম্মান করতে বসেছি, তবু প্রণাম গ্রহণ করো।' নৃত্যনাট্যে সেই নিবেদন আকুল হয়ে উঠেছে—'তোমারে করিব অসম্মান, তবু প্রণাম, তবু প্রণাম, তবু প্রণাম। 'আমি দেখব না আয়না, দেখতে পারব না', প্রকৃতির এই উক্তি নৃত্যনাট্যে রূপান্তরিত হয়ে হয়, 'আমি দেখব না, আমি দেখব না, আমি দেখব না, আমি দেখব না তোর দর্পণ' এবং এই কথাগুলিই সংলাপ-গানের শেষে আরো তীব্র হয়ে ফিরে আসে 'আমি দেখব না, আমি দেখব না, আমি দেখব না তোর দর্পণ—না না না।' গদ্যনাট্যের কথাগুলি সুরের টানে সংহতি বেগ ও ঐক্য লাভ করেছে, সঙ্গে কবিতার ধর্ম ও সুরের সংক্রমণে গদ্যের ভাষা চলে গেছে আরো কিছুদূর অর্থের বন্ধন থেকে গভীর গূঢ় ব্যঞ্জনার দিকে।

কোথাও কোথাও গদ্যনাট্যের দুইটি স্বতন্ত্র সংলাপকে একত্র করে সুর সংযোজনার দ্বারা কিঞ্চিৎ ভাষাগত পরিবর্তন করে ভাব-সাদৃশ্যের জন্য একটি অবিচ্ছিন্ন সংলাপে পরিণত করেছেন—যেমন প্রকৃতির একটি উক্তির ক্ষেত্রে দেখি।

গদ্যনাট্য

(১) তিনি বললেন, শ্রাবণের কালো মেঘকে চণ্ডাল নাম দিলেই বা কী, তাতে তার জাত বদলায় না, তার জলের ঘোচে না গুণ। তিনি বললেন, নিন্দে কোরো না নিজেকে। আত্মনিন্দা পাপ, আত্মহত্যার চেয়ে বেশী।...(১)

(২) ছি ছি মা, আবার তোকে বলছি, ভুলিস নে, মিথ্যে নিন্দে রটাস নে নিজের—পাপ সে পাপ। রাজার বংশে কত দাসী জন্মায় ঘরে ঘরে, আমি দাসী নই। ব্রাহ্মণের ঘরে কত চণ্ডাল জন্মায় দেশে, আমি নই চণ্ডাল। (২)

নৃত্যনাট্য

শ্রাবণের কালো যে মেঘ
তারে যদি নাম দাও 'চণ্ডাল'
তা বলে কি জাত ঘুচিবে তার
অশুচি হবে কি তার জল।
তিনি বলে গেলেন আমায়—
নিজেরে নিন্দা কোরো না,
মানবের বংশ তোমার,
মানবের রক্ত তোমার নাড়ীতে।
ছি ছি মা, মিথ্যা নিন্দা রটাস নে নিজের
সে যে পাপ।
রাজার বংশে দাসী জন্মায় অসংখ্য
আমি সে দাসী নই।
দ্বিজের বংশে চণ্ডাল কত আছে,
আমি নই চণ্ডালী। (২)

গদ্যসংলাপ গদ্যগানে রূপান্তরিত হতে গিয়ে কী জাতীয় ভাষাগত পরিবর্তন করা হয়েছে তার কয়েকটি নিদর্শন দিই।

গদ্যনাট্য

তোর সব চেয়ে যে নিষ্ঠুর মন্ত্র পড়িস তাই—পাকে পাকে দাগ দিয়ে জড়াক ওর মনকে। যাবে কোথায় আমাকে এড়িয়ে, পারবে কেন। (১)

নৃত্যনাট্য

পড়্ তুই সব চেয়ে নিষ্ঠুর মন্ত্র—
পাকে পাকে দাগ দিয়ে জড়ায়ে ধরুক ওর মনকে।
যেথানেই যাক, কখনো এড়াতে আমাকে
পারবে না, পারবে না। (১)

গদ্যনাট্য

এতদিনে মনে হচ্ছে, টলছে আসন, আসছে আসছে, যা বহু দূর যা লক্ষ যোজন দূর, যা চন্দ্রসূর্য পেরিয়ে, আমার দুহাতের নাগাল থেকে যা অসীম দূরে, তাই আসছে কাছে। আসছে, কাঁপছে আমার বুক ভূমিকম্পে। (২)

নৃত্যনাট্য

মা গো, এতদিনে মনে হচ্ছে যেন
টলেছে আসন তাহার।
ওই আসছে, আসছে, আসছে।
যা বহু দূরে, যা লক্ষ যোজন দূরে,
যা চন্দ্রসূর্য পেরিয়ে,
ওই আসছে, আসছে, আসছে
কাঁপছে আমার বক্ষ ভূমিকম্পে। (৩)

গদ্যনাট্যের মোট চারটি গান নৃত্যনাট্যে গৃহীত হয়েছে। তার মধ্যে একটি 'চক্ষে আমার তৃষ্ণা' আনন্দ আগমনের পূর্বে প্রকৃতির জীবনের ব্যর্থতাকে রূপায়িত করেছে, 'ফুল বলে, ধন্য আমি' গানের মধ্য দিয়ে কাহিনীর মর্ম বা থীম প্রকাশিত হয়েছে। গদ্যনাট্যে প্রকৃতির গান 'যায় যদি যাক সাগরতীরে' আকর্ষণমন্ত্রে মায়ের শিষ্যাদের নৃত্যের গান হিসাবে নৃত্যনাট্যে ব্যবহার করা হয়েছে। গদ্যনাট্যে প্রকৃতির গান 'যে আমারে দিয়েছে ডাক' নৃত্যনাট্যে পূর্ণতর রূপ লাভ করেছে। কিন্তু গদ্যনাট্যের মোট এগারোটি গান নৃত্যনাট্যে পরিত্যক্ত হয়েছে। নৃত্যনাট্যে সমস্ত সংলাপই গান বলে অপ্রয়োজনীয় স্বয়ংসম্পূর্ণ গান এখানে বর্জিত হয়েছে। এই গানগুলি স্বতন্ত্রভাবে যতই ভালো হোক এবং গদ্যনাট্যে এই গানগুলির যে স্থানই থাক, নৃত্যনাট্যে যেখানে সমস্ত সংলাপই গান সেখানে এই অখণ্ড

গানগুলি 'সমগ্রভাবে বাধাজনক' হয়ে উঠত। রাজার ছেলেকে মন্ত্র করে আনার দুঃসাহস একদিন প্রকৃতির মা দেখিয়েছিল, গদ্যনাট্যের সেই কাহিনীর আভাস নৃত্যনাট্যে নেই। পরিবর্তে নৃত্যনাট্যের প্রথম ও দ্বিতীয় দৃশ্যে রাজবাড়ির অনুচরের প্রবেশ ও তার সঙ্গে প্রকৃতির মায়ের কথোপকথন সম্পূর্ণ নূতন রচনা। গদ্যনাট্যে জেনেছিলাম প্রকৃতি অস্পৃশ্যা কিন্তু প্রত্যক্ষ করি নি। প্রকৃতির প্রতিশোধের ভিত্তিতে নৃত্যনাট্যের প্রথম দৃশ্য নূতন করে লিখিত হওয়ায়, দর্শকের সম্মুখে ফুলওয়ালি, দইওয়ালা ও চুড়িওয়ালা প্রকৃতিকে 'চণ্ডালিনীর ঝি' বলে অবজ্ঞা করায় আমরা তার মর্মবেদনা ও তার চিরজীবনের ধিক্কারকে অনেক গভীরভাবে উপলব্ধি করি। গদ্যনাট্যের প্রথম দৃশ্যে 'বেলা গেল দুপুর পেরিয়ে, কাঠফাটা রোদ, মাটি উঠেছে তেতে, পা ফেলা যায় না' অথচ মেয়ের কাজ শেষ হলো না বলে মায়ের তিরস্কারের পর প্রকৃতি মাকে বলেছিল আনন্দর জল প্রার্থনার কথা। আনন্দকে সেখানে পেয়েছিলাম আমরা প্রকৃতির বিবরণে। গদ্যনাট্যে জলপ্রার্থী আনন্দকে প্রত্যক্ষভাবে আমরা প্রথম দৃশ্যে পাই না, দ্বিতীয় দৃশ্যে নাটকের শেষে সে প্রবেশ করে বটে কিন্তু তার মুখে মন্ত্রোচ্চারণ ছাড়া কোনো কথা নেই। শ্রীমতী ঠাকুর ও নন্দিতা দেবীর দ্বারা অভিনয় করাবেন বলে স্থির করায় গদ্যনাট্যে দুইটি মাত্র চরিত্র আছে, নারীচরিত্র। পুরুষ ও মেয়ের একত্র নাচ তখনো মেনে নেয় নি সমাজ প্রসন্নভাবে। নৃত্যনাট্যের যুগে এই সামাজিক অনুদারতা দূর হওয়ায়, শান্তিনিকেতনে ছাত্রছাত্রী দুইদলের মধ্যে নৃত্যানুশীলন হতে থাকায় পরিবর্তিত রূপে শুধু আনন্দ নয়, দইওয়ালা, চুড়িওয়ালা ও রাজবাড়ির অনুচরের চরিত্র যুক্ত হয়েছে। আনন্দের প্রবেশ ও সংলাপ প্রত্যক্ষভাবে এখন উপস্থাপিত হওয়ায় প্রকৃতির প্রতিক্রিয়াও আমরা এখন স্বচক্ষে দেখি, প্রকৃতির মুখ থেকে তার বিবরণ মাত্র শুনে সন্তুষ্ট থাকতে হয় না। ফলে, দেবতা একদিন যাকে আঁধারে রেখেছিল তার 'জন্মজন্মান্তরের কালি' ধুয়ে যাওয়ার ঘটনা অনেক বেশী নাটকীয় হয়ে উঠেছে। রাজবাড়ির অনুচর রাণীমা-র পালিয়ে-যাওয়া পোষা পাখি ফিরিয়ে আনার জন্য প্রকৃতির মাকে মন্ত্র পড়তে বলেছিল—অনুচর ও মা-র এই কথোপকথন থেকে প্রকৃতির মনে পড়ে যায়, মা তো মন্ত্র পড়ে আনন্দকে ফিরিয়ে আনতে পারে। মায়ের মন্ত্রশক্তির কথা প্রকৃতিকে মনে পড়িয়ে দিয়েছে অনুচরের আবির্ভাব। সেই দিক থেকে এই নূতন অংশের যোগ সার্থক হয়েছে। চণ্ডালিকা গদ্যনাট্য শেষ হয়েছিল মন্ত্রসিদ্ধ মা আনন্দকে আকর্ষণমন্ত্রে টেনে আনার পর পাপার্ত মায়ের মৃত্যুতে—'আমার পাপ আর আমার প্রাণ দুই পড়ল তোমার পায়ে, আমার দিন ফুরল ঐখানেই—তোমার ক্ষমার তীরে এসে।' ক্ষমার তীরে আসা এবং পাপের ফলে মৃত্যু—এই দুইয়ের মধ্যে বিরোধ বোধহয় রবীন্দ্রনাথের চোখে পড়েছিল, তাই নৃত্যনাট্যে মায়ের মৃত্যু নেই। ক্ষমা প্রার্থনার মধ্যে প্রকৃতি যেন মায়ের হয়েও ক্ষমা প্রার্থনা করেছে 'মাটিতে টেনেছি তোমারে' এই পাপের জন্য। বুদ্ধের মৈত্রী ও করুণামন্ত্রের অনুগামী আনন্দ যখন 'কল্যাণ হোক তব কল্যাণী' বলে আশীর্ব্বাদ করেছে তখন সে একা প্রকৃতিকে আশীর্বাদ করে নি। রূপান্তরিত চণ্ডালিকায় প্রকৃতির মা আনন্দের ক্ষমায় উদ্ধার পেয়ে বুদ্ধবন্দনামন্ত্রে কণ্ঠযোগ করেছে। রূপান্তরের প্রত্যেকটি যোজনা নাট্যরসকে সার্থকতর করে তুলেছে। তাই রবীন্দ্রনাথ "অভিনয়ের সময় দীর্ঘ করিবার জন্য অবান্তর ঘটনা" যোগ করেছিলেন একথা রবীন্দ্রজীবনী-কার বলেন কী ভাবে বোঝা কঠিন।[১৫]

(গ) পরিশোধ ঃ শ্যামা

পরিশোধ নাট্যগীতির মুখবন্ধে রবীন্দ্রনাথ জানিয়েছেন, "কথা ও কাহিনীতে প্রকাশিত পরিশোধ নামক পদ্যকাহিনীটিকে নৃত্যাভিনয় উপলক্ষে নাট্যীকৃত করা হয়েছে।"[১৬] শ্যামা নৃত্যনাট্য এই রূপান্তরিত পরিশোধেরই "বহুশঃ পরিবর্তিত পরিবর্ধিত ও সমৃদ্ধতর রূপ বলা যায়।"[১৭] শ্যামা সম্বন্ধে রবীন্দ্রজীবনীকার জানিয়েছেন, "শ্যামা অনেকবারই শান্তিনিকেতনে অভিনীত হইয়াছে এবং রূপান্তরিত হইয়াছেও বহুবার। দ্বিতীয়বার অভিনয়ের সময় উত্তীয়ের অবতারণা ও ঘাতকহস্তে তাহার হত্যা নূতন সংযোজন।"[১৮] এই রূপান্তর-সূত্রটি বিচার করতে গেলে প্রথমে পরিশোধ কবিতা যে কথা ও কাহিনী কাব্যগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত, তার সূচনায় রবীন্দ্রনাথ যে কথাগুলি বলেছেন সেই কথা অনুধাবন করা প্রয়োজন। "একদিন এল যখন আর-একটি ধারা বন্যার মতো মনের মধ্যে নামল। কিছুদিন ধরে দিল তাকে প্লাবিত করে। ইংরেজি অলংকারশাস্ত্রে এই শ্রেণীর ধারাকে বলে ন্যারেটিভ। অর্থাৎ কাহিনী। এর আনন্দবেগ যেন থামতে চাইল না। আমার কাব্য-ভূগোলে আর একটি দ্বীপ তৈরী হয়ে উঠল। মনের সেই অবস্থায় কখনও কখনও কাহিনী বড়ো ধারায় উৎসারিত হয়ে নাট্যরূপ নিল"[১৯] কথা ও কাহিনীর কাহিনীকাব্যগুলির মধ্যে যে নাট্যবীজ ছিল তাই সমৃদ্ধতর হয়ে বড়ো আকারে নাট্যরূপ নেওয়ার কথা যখন রবীন্দ্রনাথ বলেছেন তখন নিশ্চয়ই পূজারিণীর নটীর পূজায়, পরিশোধ কবিতার পরিশোধ-শ্যামা নৃত্যনাট্যে রূপান্তরের কথা মনে রেখে বলেছেন। এই ন্যারেটিভ-কবিতাগুলির চরিত্রবিচার করতে গিয়ে ঐ সূচনার শেষে তিনি বলেছেন, "এই সময়ে আমার কাব্যে একটি মহল তৈরি হয়ে উঠেছে যার দৃশ্য জেগেছে ছবিতে, যার রস নেমেছে কাহিনীতে, যাতে রূপের আভাস দিয়েছে নাটকীয়তায়।"[২০] এই গ্রন্থের কথা অংশের কবিতাগুলি যার মধ্যে পরিশোধ অন্তর্ভুক্ত সেগুলিকে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন

'চিত্রশালা',[১৯] বলেছেন "তাদের মধ্যে গল্পের শিকল গাঁথা নেই, তারা এক-একটি খণ্ড খণ্ড দৃশ্য।"[১৯] এই মন্তব্যগুলি পরিশোধ কবিতা সম্বন্ধে বিশেষভাবে ঘাটে। চিত্র বা দৃশ্য পাই নৌকার গমনপথের দুধারে গ্রাম-দৃশ্যে, আসন্ন সন্ধ্যা ও অরণ্যের দৃশ্যে, ঘটনা-বর্ণনার মধ্যে আছে কাহিনীরস, শ্যামা ও বজ্রসেনের সংলাপের মধ্যে আছে নাটকীয়তা। সাহিত্যের অন্য শাখায় যেখানে ঘটনা বর্ণিত হয়, সেখানে নাটকে ঘটনা দর্শক-শ্রোতার সামনে প্রত্যক্ষভাবে উপস্থিত হয়—এই প্রত্যক্ষতা নাটক ও চিত্রের সাধারণ ধর্ম। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য ভারতীয় অলংকারশাস্ত্রে নাটকের নাম দৃশ্যকাব্য। এই দৃশ্যময়তা চিত্রময়তা প্রত্যক্ষতা যদি নাটকের গুণ হয় তাহলে সেই গুণ কথা ও কাহিনীর কথা অংশের কবিতাগুলিতে—বিশেষ করে পরিশোধে- বর্তমান। নাটকের প্লটের বীজ রয়েছে কবিতাটির ঘটনাবস্তুতে, নাটকীয়তার আভাস এত দূর পর্যন্ত শ্যামা ও বজ্রসেনের কথোপকথনে আছে যে অনতিদীর্ঘ কবিতাটি সমৃদ্ধতর নৃত্যনাট্যে রূপান্তরিত হওয়ার সময়, সুরের প্রয়োজনে কথার বিন্যাসগত পরিবর্তন বাদ দিলে, অনেক ক্ষেত্রে প্রায় সেই সংলাপ হুবহু গৃহীত হয়েছে। এই সমস্ত কারণেই পরিশোধ কবিতাকে অনায়াসে রবীন্দ্রনাথ নৃত্যনাট্যে রূপান্তরিত করতে পেরেছিলেন।

পরিশোধ কবিতার সঙ্গে পরিশোধ নৃত্যনাট্যের যোগ নিবিড়। পরিশোধ কবিতায় নিষ্কারণে বন্দী বজ্রসেনকে মুগ্ধ শ্যামা কারাগার থেকে মুক্ত করেছিল। কী সম্পদে শ্যামা তাকে মুক্ত করেছে প্রণয়িনীর কাছে বারবার বজ্রসেন জানতে চাওয়ায় শেষ পর্যন্ত নিরুপায় শ্যামা প্রেমোন্মত্ততায় তার যে অপরিসীম পাপ সেই পাপকাহিনী বলতে বাধ্য হয়েছে।

বালক কিশোর
উত্তীয় তাহার নাম, ব্যর্থ প্রেমে মোর
উন্মত্ত অধীর। সে আমার অনুনয়ে
তব চুরি-অপবাদ নিজ-স্কন্ধে লয়ে
দিয়েছে আপন প্রাণ।

পরিশোধ নৃত্যনাট্যেও শ্যামার মুখ দিয়ে প্রায় একই ভাষায় উত্তীয়ের আত্মবলিদানের কথা বলা হয়েছে। কিন্তু পরিশোধ কবিতা ও নৃত্যনাট্য এই দুইরূপের কোনটিতেই উত্তীয় চরিত্রকে প্রত্যক্ষভাবে পাই না। শ্যামা নৃত্যনাট্যে একই ভাষায় বজ্রসেনকে নায়িকা তার লজ্জাকাহিনী বলেছে বটে, কিন্তু এই সর্ব্বশেষ রূপে উত্তীয় অনুপস্থিত নয়। শ্যামা যখন আহ্বান করেছে—

ওগো শোনো, ওগো শোনো, ওগো শোনো—
আছ কি বীর কোনো
দেবে কি ওরে জড়িয়ে মরিতে
অবিচারের ফাঁদে
অন্যায় অপবাদে। (২)

তখন উত্তীয় সাড়া দিয়েছে, 'ন্যায় অন্যায় জানি নে জানি নে—শুধু তোমারে জানি তোমারে জানি, ওগো সুন্দরী'। উত্তীয়ের গোপন ব্যথার নীরবরাত্রির অবসান হয়েছে যখন প্রহরীকে গিয়ে সে বলেছে 'বিদেশী নহে সে তব শাসনপাত্র—আমি একা অপরাধী।' উত্তীয়ের হত্যাদৃশ্যও পূর্ব্বরূপে ছিল না। উত্তীয়-কাহিনী যোগের ফলে উত্তীয়-চরিত্র, যার কথা আমরা এতদিন শুনেছিলাম মাত্র, তাকে প্রত্যক্ষ পেলাম, তার মহিমা পরিস্ফুট তার আচরণে, শ্যামার প্রতি ভালোবাসায়, করুণায় এবং শ্যামার জন্য আত্মনিবেদনে। নায়ক-নায়িকার সঙ্গে এই তৃতীয় কোণ যুক্ত হওয়ায় নাটকীয়তা এই শেষ রূপান্তরে বহুগুণে বৃদ্ধি পেল। শ্যামা ও বজ্রসেনের মধ্যে যার মৃতদেহ চিরদিনের জন্য শায়িত হয়ে তাদের মধ্যে চির-ব্যবধান রচনা করল, পরিশোধ কবিতা যেহেতু কাহিনী-কাব্য তাই সেখানে তার অনুপস্থিতি ততটা ক্ষতিকারক না হলেও, পরিশোধ নৃত্যনাট্যে তার অনুপস্থিতি অবশ্যই ক্ষতিকারক হয়েছিল। সেই ত্রুটি রবীন্দ্রনাথ শ্যামায় মোচন করেছেন। উত্তীয়ের হত্যাদৃশ্য যোগের সঙ্গে ঘটেছে একটি তাৎপর্যপূর্ণ পরিবর্তন। হত্যার পূর্বাহ্নে শ্যামা তার ছলনা, তার মিথ্যাচার অপসারিত করে 'দোষী ও যে নয় নয়' এই কথা বলতে বলতে কারাগারে প্রবেশ করেছে। যদিও তার প্রবেশে প্রহরী নিরস্ত্র হয় নি, কিন্তু বোঝা যায় বজ্রসেনের তিরস্কারের পূর্বেও শ্যামা বিবেক-দংশনে, পাপের ভারে জর্জরিত হয়েছিল। উদ্ধারের প্রণালী বজ্রসেন জানতে চাইলেই শ্যামা বাধা দিয়ে বলেছে 'নহে নহে নহে। সে কথা এখনও নহে।' সে ভেবেছিল প্রেমে দুজনের যেদিন সমস্ত ব্যবধান দূর হয়ে যাবে সেদিন এ পাপকাহিনী বললে বজ্রসেন তাকে ক্ষমা করতে পারবে। বজ্রসেন কোথাও ক্ষমা করে নি, কবিতায় না, নৃত্যনাট্যে না। পরিশোধ কবিতায় বজ্রসেন শ্যামাকে প্রত্যাখ্যান করে

হেরিল শয্যায়
একটী নূপুর আছে পড়ি ; শতবার
রাখিল বক্ষেতে চাপি। ঝংকার তাহার
শতমুখ শরসম লাগিল বর্ষিতে
হৃদয়ের মাঝে, ছিল পড়ি এক ভিতে
নীলাম্বর বস্ত্রখানি, রাশিকৃত করি
তারি পরে মুখ রাখি রহিল সে পড়ি
সুকুমার দেহগন্ধ নিশ্বাসে নিঃশেষে
লইল শোষণ করি অতৃপ্ত আবেশে।

এই অবস্থায় শ্যামা পুনরায় এলে বজ্রসেন পুনরায় তাকে প্রত্যাখ্যান করেছে। তখন ফেলে দিয়েছে নূপুর, ফেলে দিয়েছে ছুঁড়ে নীলাম্বর। পরিশোধ ও শ্যামা নৃত্যনাট্যে নীলাম্বরবস্ত্রের কথা নেই, কিন্তু নূপুর কুড়িয়ে নিয়ে আত্মগত চিন্তার কথা আছে। এখানেও শ্যামা পুনরায় প্রবেশ করলে পুনরায় সে প্রত্যাখ্যাত হয়েছে। কিন্তু শ্যামার পুনঃ প্রবেশের পূর্ব্বে নূপুর কুড়িয়ে নেবার নির্দেশবাক্য আছে, পরে নূপুর ফেলে দেবার কোন নির্দেশ নেই।

পরিশোধ নৃত্যনাট্যে চারটে দৃশ্য, শ্যামাতেও তাই। কিন্তু দৃশ্যসংখ্যা সমান হলেও এই রূপান্তরকালে শুধু যে পুনর্বিন্যাস হয়েছে তাই নয়, বহু নূতন অংশ যুক্ত হয়েছে, কিছু পুরাতন অংশ বর্জিত হয়েছে। ফলে পরিশোধের তুলনায় আয়তনে শ্যামা দুই গুণ বেড়েছে। পরিশোধের প্রথমে পথপার্শ্বে শ্যামার যে নাম-না-জানা অতিথির জন্য অপেক্ষার গান, তাকে বর্জন করে শ্যামায় প্রথমেই আমরা নাটকীয় ঘটনায় প্রবেশ করেছি—নাটক আরম্ভ হয়েছে বন্ধু ও বজ্রসেনের মধ্যে ইন্দ্রমণির হার সম্বন্ধে কথোপকথন সংগীত দিয়ে। ইন্দ্রমণির হারের উপাখ্যানটিও নূতন রচনা—পরিশোধ কবিতায় বা নৃত্যনাট্যে এর কোন পূর্ব্বাভাস ছিল না। বস্তুতপক্ষে বন্ধু ও বজ্রসেন এবং কোটাল ও বজ্রসেনের সংলাপ-গান-সম্বলিত শ্যামার প্রথম দৃশ্য সম্পূর্ণ নূতন রচনা। পরিশোধের প্রথম দৃশ্যে শ্যামার অপেক্ষার গানের পর প্রহরী ও বজ্রসেন প্রবেশ করেছিল এবং সেই সময় বজ্রসেনকে দেখে শ্যামা মুগ্ধ হয়েছিল। শ্যামায় সেই দৃশ্যটি বহুল পরিমাণে পরিবর্তিত হয়ে দ্বিতীয় দৃশ্যে পরিণত হয়েছে। এখানে 'ধর্ ধর্, ওই চোর, ওই চোর' বলে বজ্রসেনের পিছনে পিছনে কোটালের ছুটে আসা থেকে বন্দী বজ্রসেনকে নিয়ে প্রহরীর প্রস্থান পর্যন্ত সংলাপ পরিশোধ থেকে শ্যামায় অবিকৃতভাবে গৃহীত হয়েছে। কিন্তু তার পূর্বে সখীদের সঙ্গে কথোপকথনে উত্তীয়ের সংবাদ আমরা পাই—যে উত্তীয় 'বহিয়া বিফল বাসনা' ফিরে ফিরে আসে, যে উত্তীয় 'মায়া-বনবিহারিণী হরিণী গহন স্বপনসঞ্চারিণী'কে ধরার পণ করেছে এবং যে উত্তীয়কে সখীরা বলেছে 'হে প্রেমিক তাপস, নিঃশেষে আত্ম-আহুতি ফলিবে চরম ফলে।' উত্তীয়ের প্রস্থানের পর শ্যামার প্রবেশ এবং এই সময় শ্যামার প্রতি সখীর যে উক্তি তাতে সখী একদিকে বহমান সময়ের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছে এবং অন্যদিকে উত্তীয়ের প্রতি বিমুখ ব্যবহারের জন্য শ্যামাকে প্রকারান্তরে তিরস্কার করেছে, বলেছে 'জীবনে পরম লগন কোরো না হেলা' এবং বলেছে, যে মানুষ আসে তাকে যেন দুঃখের পণে চিনে নেয়। শ্যামা জানিয়েছে সেই দুর্লভ ধন, সেই মনের মানুষের দেখা সে এখনও পায় নি। তারপর কোটাল-বজ্রসেন, শ্যামা, সখী ও কোটালের সংলাপ পরিশোধ নৃত্য-নাট্য থেকে পূর্বেই বলেছি অবিকৃতভাবে গৃহীত হয়েছে। পরিশোধে শ্যামা প্রহরীর নিকট দুই দিন সময় চেয়ে নেওয়ার পর বজ্রসেন বলেছিল—

অচেনা নির্মম ভুবনে দেখিনু একী সহসা
কোন অজানার সুন্দর মুখে সান্ত্বনা হাসি। (১)

এবং তারপরেই দৃশ্যাবসান হয়েছিল। শ্যামাতে বজ্রসেনের এই উক্তিটি গৃহীত হয় নি এবং যুক্ত হয়েছে দীর্ঘ গুরুত্বপূর্ণ একটি নূতন অংশ। শ্যামা বজ্রসেনকে মুক্ত করার জন্য কোন বীরকে আহ্বান করলে উত্তীয় এসেছে, আত্মনিবেদন করতে চেয়েছে শ্যামার প্রয়োজনে। জীবনে শ্যামাকে পায় নি, তাই মরণে শ্যামাকে সে পেতে চায় এই আত্মনিবেদনের মাধ্যমে। সে বলেছে,

প্রিয় যে তোমার, বাঁচাবে যারে,
নেবে মোর প্রাণঋণ
তাহারি সঙ্গে তোমারি বক্ষে
বাঁধা রব চিরদিন
মরণডোরে। (২)

নাটকীয় বিদ্রূপের মধ্য দিয়ে শ্যামার প্রতি যেন অভিশাপ বর্ষিত হলো। মৃত্যুর ফলে উত্তীয় বজ্রসেনের সঙ্গে সমকক্ষের মতো শ্যামার বক্ষে চিরদিনের জন্য শুধু বাঁধা হয়ে গেল না, সে শ্যামা-বজ্রসেনের মিলনপথে দুর্লঙ্ঘ্য ব্যবধান রচনা করল। এর পরে শ্যামা-উত্তীয়ের সংলাপে উত্তীয়ের মহিমা যেমন দর্শক-শ্রোতার কাছে পরিস্ফুট হয়েছে, তেমনি শ্যামা যেন এই প্রথম উত্তীয়ের সেই মহিমা উপলব্ধি করেছে। উত্তীয় বজ্রসেনের মিথ্যা অপরাধের বোঝা নিজ স্কন্ধে তুলে নিলে কোটাল তাকে ধরে নিয়ে গিয়েছে—আর্তনাদ করেছে সখী 'বুক যে ফেটে যায় হায় হায় রে।' তারপর কারাগারে উত্তীয়-হত্যার দৃশ্য এবং হত্যার পূর্বাহ্নে বিবেকদষ্ট অনুতপ্ত শ্যামার বাধা-দানের বৃথা চেষ্টা। কারাগারে শ্যামা ও বজ্রসেনের কথোপকথন ছিল পরিশোধের দ্বিতীয় দৃশ্যে, শ্যামায় তৃতীয় দৃশ্যে। শ্যামাকে দেখে বজ্রসেন বলেছে 'এ কী আনন্দ!' শ্যামায় বলেছে 'আহা, এ কী আনন্দ!' এই উক্তির পূর্বে শ্যামা প্রথমে নিজের মনের অজানিত আশঙ্কাকে ভাষা দিয়েছে এবং পরে বিদেশীকে সম্ভাষণ জানিয়েছে। কিন্তু পরিশোধ নৃত্যনাট্যে এই দৃশ্যের শেষে শ্যামার গান 'চরণ ধরিতে দিয়ো গো আমারে' রূপান্তরে বর্জিত হয়েছে এবং পরিবর্তে সখীর সংগীত-মন্তব্য যুক্ত হয়েছে। পরিশোধ নৃত্যনাট্যের তৃতীয়-চতুর্থ দৃশ্য একত্রিত হয়ে শ্যামার দীর্ঘ চতুর্থ দৃশ্যটি রচিত হয়েছে। কিন্তু এর মধ্যে অনেক পরিবর্তন ও রূপান্তর আছে। পুর-সুন্দরী শ্যামা যে বজ্রসেনের সঙ্গে পালিয়েছে তার জন্যে কোটালের শোচনা নূতন উপাদান, নূতন রচনা সখীগণ ও প্রহরীর কথোপকথন। পরি-শোধের তৃতীয় দৃশ্যের প্রথমে শ্যামার গান 'এবার ভাসিয়ে দিতে হবে আমার এই তরী' শ্যামা নৃত্যনাট্যে পরিত্যক্ত হয়েছে। বজ্রসেন জানতে চেয়েছে কী উপায়ে তাকে মুক্ত করা হয়েছে, শ্যামা বলতে কুণ্ঠা বোধ করেছে এবং পরে বলতে বাধ্য হয়েছে, স্তম্ভিত এবং ক্রুদ্ধ বজ্রসেন শ্যামাকে করেছে আঘাত—এই পর্যন্ত সমস্ত সংগীত-সংলাপ পরিশোধ থেকে শ্যামায় অবিকৃতভাবে গৃহীত, শুধু সহচরীর পরামর্শ 'নীরবে থাকিস সখী, ও তুই নীরবে থাকিস' নূতন যোজনা। যখন শ্যামা বলেছে 'ছাড়িব না' তখন বজ্রসেনের অভিনয় সম্বন্ধে পরিশোধে নির্দেশবাক্য ছিল 'শ্যামাকে বজ্রসেনের হত্যার চেষ্টা', শ্যামাতে সেই নির্দেশবাক্য পরিবর্তিত হয়েছে 'শ্যামাকে বজ্রসেনের আঘাত ও শ্যামার পতন'। এই ঘটনার পর দুই ক্ষেত্রেই নেপথ্যে মন্তব্য হয়েছে 'হায়! একী সমাপন!' এখানেই পরিশোধের তৃতীয় দৃশ্য সমাপ্ত হলো। কিন্তু এই সঙ্গে পরিশোধের চতুর্থ দৃশ্য যুক্ত হয়ে শ্যামার চতুর্থ দৃশ্য রচিত হয়েছে। দুই ক্ষেত্রেই পল্লীরমণীর গান, যদিও গানের ভাষা স্বতন্ত্র। এই গানের পর পরিশোধে বজ্রসেনের মুখে 'ক্ষমিতে পারিলাম না যে, ক্ষমো হে মম দীনতা, পাপীজনশরণ প্রভু,' এই বিনতি সংগীত ব্যবহার করা হয়েছে। এই গানের পর মরণলোক থেকে নূতন প্রাণ নিয়ে আসার জন্য বজ্রসেন প্রিয়াকে আহ্বান করেছে এবং প্রিয়ার পরিত্যক্ত নূপুর পেয়ে নীরব ক্রন্দন এবং মধুর স্মরণের মিশ্রানুভূতিতে মগ্ন হয়েছে। শ্যামা এলে পুনরায় সে প্রত্যাখ্যাত হয়েছে। শ্যামা প্রণাম করে বিদায় নিলে 'ধিক ধিক ওরে মুগ্ধ' বলে বজ্রসেন নিজের প্রণয়কাতর হৃদয়কে বিবেকতাড়নায় তিরস্কৃত করেছে। নেপথ্যে মন্তব্যসংগীত ভেসে এসেছে 'কঠিন বেদনার তাপস দোঁহে, যাও চিরবিরহের সাধনায়।' কিন্তু পাপীজনশরণ প্রভুর কাছে ক্ষমাপ্রার্থনার গান সংগতিহীনভাবে পূর্ব্বে ব্যবহৃত হওয়ায় এবং শেষের নেপথ্য মন্তব্য-সংগীত নিতান্ত আরোপিত এবং সদুপদেশমূলক হওয়ায় পরিশোধ নৃত্যনাট্যে নাট্যরস ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। শ্যামাতে পরিণতির পুনর্বিন্যাসের ফলে নাটকীয়তার প্রভূত উন্নতি হয়েছে। 'এসো এসো, এসো প্রিয়ে, মরণলোক হতে নূতন প্রাণ নিয়ে' এই গানের পর শ্যামায় নূপুর নিয়ে স্মৃতিরোমন্থন করেছে বজ্রসেন। পরিশোধের চতুর্থ দৃশ্যের প্রথমে পল্লীরমণীর গান এর পরে নেপথ্যগান হিসাবে যুক্ত হয়েছে—ভালো আর মন্দের দ্বন্দ্ব কেন মিটল না এই ক্ষোভ সেই নেপথ্যগানে প্রকাশ পেয়েছে। পল্লীরমণীর কণ্ঠে এই গান অসংগত ছিল, শ্যামায় পল্লীরমণীর কণ্ঠে সংগত নবরচিত গান ব্যবহার করে এই গানটিকে নেপথ্য মন্তব্য হিসাবে প্রয়োগ করা হয়েছে। এর পরে যখন পুনরায় একই ভাষায় 'এসো এসো, এসো প্রিয়ে' বলে অন্তরবেদনায় আহ্বান জানিয়েছে বজ্রসেন, তখন ক্ষমাপ্রার্থিনী শ্যামা ফিরে এসেছে। কিন্তু পুনঃপুনঃ প্রত্যাখ্যান করেছে তাকে বজ্রসেন। শ্যামা চলে গেলে তখন বজ্রসেন পাপীজনশরণ প্রভুর কাছে তার বেদনা নিবেদন করেছে, ক্ষমা করতে না পারার অপরাধের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেছে। এই গান পরিশোধে অস্থানে ব্যবহৃত হওয়ায় তার তাৎপর্য সর্বাংশে পরিস্ফুট হয় নি, কিন্তু শ্যামায় এই গানটি পরম গভীরতায় নাটকের উপর উপযুক্ত সমাপ্তির যোগ্য যবনিকা টেনে দিয়েছে। পরিণামে পরিশোধের মতো কোন নেপথ্য-সংগীত 'গভীর বিষাদের শান্তি পাও হৃদয়ে' এই জাতীয় উপদেশ বর্ষণ করে নাট্যসংগতিকে নষ্ট করে নি, শিল্পগুণকে ক্ষতিগ্রস্ত করে নি।

মালিনী নাটকে গ্রীকনাট্যকলার প্রতিরূপ কোন কোন পাশ্চাত্য রসজ্ঞ লক্ষ্য করেছিলেন।[২০] রবীন্দ্রনাথের যদিও মনে হয়েছিল গ্রীকনাট্যসুলভ দেশকালে অবিচ্ছিন্নতা মালিনীতে আছে, তবু তিনি স্বীকার করেছিলেন গ্রীকনাট্যকলা তাঁর অভিজ্ঞতার বাহিরে। বস্তুত যে নিয়তি গ্রীকনাট্যের নরনারীর ভাগ্যের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে থেকে তাদের জীবনপরিণামকে নিয়ন্ত্রিত করে মালিনী নাটকে সেই নিয়তির কোন সর্বত্রব্যাপী ছায়া আমরা লক্ষ্য করি না। বরং শ্যামা নৃত্যনাট্যের মধ্যে ঠিক গ্রীক নিয়তিধারণা না হলেও নিয়তির

একটি গূঢ় উপস্থিতি লক্ষ্য করি। উত্তীয়ের আত্মত্যাগকে শ্যামা যে নির্বিবেকে মেনে নিল সঙ্গে সঙ্গে তার প্রেমে নিয়তির অভিশাপ লাগল এবং শেষ পর্যন্ত প্রণয়ীযুগল নিয়তিতাড়িতের মতো ছুটে ব্যর্থ পরিণামকে স্বীকার করে নিতে বাধ্য হলো। বজ্রসেন শ্যামা যখন 'প্রেমের জোয়ারে ভাসাবে দোঁহারে' গানের মধ্যে প্রেমতরঙ্গে মগ্ন তখন সখী নিয়তির কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছে—

অন্ধ অদৃষ্টের আহ্বানে
কোথা অজানা অকূলে চলেছিস ভাসি, (৩)

বলেছে, নিয়তি বা অদৃষ্ট নামক নির্মম ব্যাধ এই প্রণয়ীযুগলের জন্য মরণের ফাঁসি রচনা করছে। নিয়তির যে মৌলিক লক্ষণ নাটকে নিহিত থাকে নাটকের ট্র্যাজিক আয়রনির মধ্যে, তার কথাও সখীর এই কোরাস-উক্তির মধ্যে সুস্পষ্টভাবে পাই। সখী বলেছে, এই প্রেমমগ্নতার

রঙিন মেঘের তলে গোপন অশ্রুজলে
বিধাতার দারুণ বিদ্রূপবজ্রে
সঞ্চিত নীরব অট্টহাসি হা হা। (৩)

যে ট্র্যাজিক আয়রনির মধ্যে নাটকে নিয়তির প্রকাশ হয়, সেই আয়রনিই 'বিধাতার দারুণ বিদ্রূপ বজ্র'।

শ্যামা নৃত্যনাট্যে যে ট্র্যাজিক অমোঘতা, সরল বাহুল্যবর্জিত অনিবার্য ট্র্যাজিক লক্ষ্যাভিমুখী যে গতি আছে তা রবীন্দ্রনাথের অন্য কোন নাটকে নেই। নিয়তি-তাড়িত প্রণয়ীযুগল অবশ্যম্ভাবী শূন্যতার সম্মুখীন হয়েছে পরিণামে এবং শূন্যতার মধ্যে কোন বৃথা সান্ত্বনা অনুসন্ধান না করে, তাকে অবিচলিতভাবে স্বীকার করে নিয়েছে। এই নৃত্যনাট্যেই যেহেতু রবীন্দ্রনাথ গ্রীকনাট্যের মৌলিক উপলব্ধির সর্বাধিক নিকটে এসেছিলেন, বোধহয় সেই জন্যেই গ্রীকনাট্যকলার সঙ্গেও এখানে তিনি জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে সাধর্ম্য-রক্ষার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছিলেন। ট্র্যাজিকধারণার এই সাদৃশ্যবশতই হোক বা অন্য যে কোন কারণেই হোক গ্রীক নাটকে কোরাস নামক যে যূথবদ্ধ চরিত্র যে রঙ্গমঞ্চে উপস্থিত থেকে ঘটনাচক্র ও পাত্রপাত্রীর ভাগ্য থেকে নির্লিপ্ত হয়ে নিয়তির অমোঘগতির সম্বন্ধে মন্তব্য করে, ঘটনাচক্র ও পাত্রপাত্রীর প্রতিক্রিয়াকে দর্শকের কাছে ব্যাখ্যা করে এবং দর্শকের মানসিক প্রতিক্রিয়াকে ভাষা দেয়,[২১] তার প্রতিরূপ পাই শ্যামা নৃত্যনাট্যে। পরিশোধ নাট্যগীতিতেই এই কোরাসের প্রতিরূপের আভাস এসেছিল নেপথ্যসংগীতে। কিন্তু গ্রীকনাট্যে কোরাস থাকে রঙ্গমঞ্চে উপস্থিত, কিন্তু পরিশোধে কোরাসসুলভ মন্তব্যগুলি নেপথ্যগানে পাই। নেপথ্যে থাকায় এই মন্তব্যগুলি কোরাসজাতীয় কোন যৌথকুশীলবের নির্লিপ্ত মন্তব্য হিসাবে গ্রহণ করা যায় না, মনে হয় নাট্যকার নিজেই এই সংগীত-মন্তব্যগুলির মাধ্যমে নিজের মতামত প্রকাশ করেছেন। পুনঃপুনঃ এই জাতীয় নেপথ্যসংগীতে নাট্যকারের মতামত নাটকে অনুস্যূত না হয়ে স্বতন্ত্র হয়ে থাকে বলে সেগুলি নাট্যরস ও নাট্যগতিকে বাধা দেয়। পরিশোধে নেপথ্যসংগীতের মাধ্যমে যে দুইটি মন্তব্য আছে তার মধ্যে নাট্যশেষের মন্তব্য—'কঠিন বেদনার তাপস দোঁহে, যাও চিরবিরহের সাধনায়' ইত্যাদি পংক্তিগুলি আলোচনা করলে দেখা যাবে, এ কোন কোরাসের কণ্ঠস্বর নয়, এ স্বয়ং নাট্যকারের কণ্ঠস্বর। গ্রীকনাট্যকলায় কোরাসের মধ্যে যে নাট্যকারের কণ্ঠস্বর থাকে না তা নয়, কিন্তু সেই কণ্ঠস্বরকে সেখানে নাট্যকার স্বীয় ব্যক্তিত্ব-মুক্ত একটি স্বাতন্ত্র্য দান করেন। নাট্যকারের এই নৈর্ব্যক্তিক স্বাতন্ত্র্য পরিশোধের মন্তব্যগুলিতে নেই, শ্যামার মন্তব্যগুলিতে আছে। গ্রীকনাটকে কোরাস রঙ্গমঞ্চে উপস্থিত থাকে, শ্যামাতেও যে সখীর মুখে কোরাসসুলভ সংগীতমন্তব্যগুলি বসানো হয়েছে সে আর নেপথ্যে নেই, সে এখন রঙ্গমঞ্চে উপস্থিত। নেপথ্য থেকে রঙ্গমঞ্চের প্রত্যক্ষতায় আসার ফলে, সখীচরিত্রের মুখ দিয়ে এই ভূয়োদর্শী মন্তব্যগুলি উচ্চারিত হওয়ায় সেগুলি অনেকাংশে নাট্যকারের মন্তব্য থাকে নি, চরিত্রের মুখ দিয়ে বিশেষ পরিবেশে উচ্চারিত হওয়ায় নাট্যকারের মন্তব্য এখানে শিল্পসংগত নৈরাত্মসিদ্ধি ও দূরত্ব অর্জন করেছে। ফলে নাট্যরস ও নাট্যগতিও বাধাগ্রস্ত হয় নি। এই কোরাস জাতীয় মন্তব্যের মধ্যে একটির ব্যাখ্যা ইতিপূর্ব্বে করেছি। এখানে আরো দুই-একটির কথা উল্লেখ করি। প্রহরীকর্তৃক উত্তীয়কে হত্যার পর সখীর মুখে উচ্চারিত হয়েছে—

কোন্ অপরূপ স্বর্গের আলো
দেখা দিল রে প্রলয়রাত্রি ভেদি দুর্দিনদুর্যোগে,
মরণমহিমা ভীষণের বাজাল বাঁশি। (২)

চতুর্থ দৃশ্যে পলাতক প্রণয়ী-যুগলের মঞ্চে প্রবেশের পূর্ব্বাহ্নে সখীর মন্তব্য-গান পাই

কোন্ বাঁধনের গ্রন্থি বাঁধিল দুই অজানারে
এ কী সংশয়েরই অন্ধকারে।
দিশাহারা হাওয়ায় তরঙ্গ দোলায়
মিলনতরীখানি যায় রে কোন্ বিচ্ছেদের পারে। (৪)

কিন্তু শ্যামা 'ছাড়িব না, ছাড়িব না, ছাড়িব না' বললে বজ্রসেন যখন তাকে আঘাত করেছিল তখন পরিশোধ নাট্যগীতিতে 'হায় ! এ কী সমাপন !' গান নেপথ্যে গীত হয়েছিল, শ্যামাতেও রবীন্দ্রনাথ এই গানটিকে রঙ্গমঞ্চের প্রত্যক্ষতায় কোন পাত্রপাত্রীর মুখে বসান নি, এখানেও এটি নেপথ্যসংগীত রয়ে গেছে। সম্ভবত প্রেমিক-প্রেমিকার এই বেদনারক্তিম নিভৃত আলাপনের মাঝখানে কোন সখীচরিত্রকে উপস্থিত করার বাস্তব অসংগতির কথা চিন্তা করেই রবীন্দ্রনাথ এখানে সঙ্গীতমন্তব্যটি নেপথ্যে স্থাপিত করেছেন। কিন্তু যখন এই গান হয় তখন তাকে নাট্যকারের মন্তব্য বলে নয়, সখীর বলেই মনে করি।

এই প্রসঙ্গে আরো একটি কথা উল্লেখযোগ্য। চিত্রাঙ্গদার তুলনায় আমরা চণ্ডালিকায় দেখেছি আঙ্গিকগত অগ্রগতি কিন্তু চণ্ডালিকার তুলনায় শ্যামায় কোনো আঙ্গিকগত অগ্রগতি নেই। এখানে অগ্রগতি প্রধানত ধারণা ও উপলব্ধিগত। যে ট্রাজিক ধারণা শ্যামা নৃত্যনাট্যে মূর্ত হয়েছে তারই প্রয়োজনে কোরাসজাতীয় মন্তব্য-গান শ্যামায় যুক্ত হয়েছে, সুতরাং কোরাস-ব্যবহারের এই আঙ্গিকগত পরীক্ষার কারণও শেষ পর্যন্ত নিহিত আছে এই ট্র্যাজিক ধারণা ও উপলব্ধির মধ্যে। চণ্ডালিকার মধ্যে নিয়তি বা বিধাতার 'বিদ্রূপবজ্র' নেই, প্রকৃতির যে যন্ত্রণা যে বেদনা তাও শেষ পর্যন্ত ট্র্যাজেডির নগ্নতায় সমাপ্ত হয় নি, তার জীবনের অন্ধকারের উপরে পড়েছে 'তব চরণ জ্যোতির্ময়', এখানে 'দীপ্ত সমুজ্জ্বল, শুভ্র সুনির্মল সুদূর স্বর্গের আলো'। একটি অধ্যাত্ম পরিবেশ, পূজার পরিমণ্ডল চণ্ডালিকার ট্র্যাজিক সম্ভাবনাকে আত্মপ্রকাশের সুযোগ দেয় নি। আকর্ষণমন্ত্র ব্যবহারের জন্য প্রকৃতি আনন্দের কাছে ক্ষমাভিক্ষা করেছে, অপরপক্ষে বজ্রসেন ক্ষমাভিক্ষা করেছে বিধাতার কাছে তার ক্ষমাহীনতার জন্য। চণ্ডালিকার শেষে পুণ্যলোকের প্রভা, আনন্দ ক্ষমা করে বলেছে 'কল্যাণ হোক তব, কল্যাণী', বুদ্ধবন্দনা-মন্ত্রোচ্চারণের মধ্যে যবনিকাপাত হয়েছে। কিন্তু বজ্রসেন ক্ষমা করতে পারেনি শ্যামাকে, আর সে অনুমান করেছে—

ক্ষমিবে না, ক্ষমিবে না,
আমার ক্ষমাহীনতা পাপীজনশরণ প্রভু। (৪)

ঈশ্বরের পক্ষে যা সম্ভব, মানুষ বজ্রসেনের পক্ষে তা সম্ভব হয় নি। একজিস্টেন্সিয়ালিজমের পরিভাষায় যাকে মানুষের 'predicament'[২২] বলা হয়, শ্যামা নৃত্যনাট্যে মানুষের সেই অবশ্যম্ভাবী ট্র্যাজিক পরিমণ্ডলের পরিচয় পাই। এখানে কোন আধ্যাত্মিক প্রভা এসে মানব-অস্তিত্বের মালিন্যকে ধৌত করে নি—পাপপুণ্য, 'ভালো ও মন্দ' নিয়ে মানুষের যে নিয়তিতাড়িত বিবেকনিয়ন্ত্রিত অমোঘ ট্র্যাজিক ভাগ্য তাই শ্যামায় রূপায়িত হয়েছে। মর্তের ক্লেদ ও করুণা, জ্যোতি ও যন্ত্রণা শ্যামায় বর্তমান, কিন্তু চণ্ডালিকায় নাটকার প্রকৃতিকে নিয়ে গিয়েছেন অতিপ্রাকৃতে 'অন্ধকারের ঊর্ধ্বে', 'পুণ্যলোকে'। সুতরাং চণ্ডালিকার তুলনায় শ্যামায় কোন তাৎপর্যপূর্ণ আঙ্গিকগত অগ্রগতি না হলেও, জীবনোপলব্ধি সম্বন্ধে অন্ধকারপূর্ণ মহিমাময় এমন ধারণা এখানে এসেছে যা ইতিপূর্বে ছিল না, রবীন্দ্রনাথের কোন কোন তীব্র নাট্যগুণান্বিত চিত্রের সঙ্গে মাত্র এই উপলব্ধির তুলনা চলে। শ্যামা ধরা পড়েছে অস্তিত্বের জটিলতায়—স্বকৃত-কর্মের দায়িত্বের 'anguish'[২৩] তার মধ্যে মূর্ত হয়েছে।

এই রূপান্তর বিবরণ সমাপ্ত করবার পূর্বে পরিশোধ কবিতায় বজ্রসেন ও শ্যামার যে সামান্য পরিমাণ অথচ গুরুত্বপূর্ণ সংলাপ ছিল তাকে সুরের প্রয়োজনে কীভাবে পরিশোধ নাট্যগীতি ও শ্যামা নৃত্যনাট্যে রবীন্দ্রনাথ রূপান্তরিত করেছিলেন তা দেখাচ্ছি। সামান্য কয়েকটি ব্যতিক্রম ব্যতীত অন্যত্র পরিশোধ কবিতার সংলাপ পরিশোধ নাট্যগীতিতে যেভাবে রূপান্তরিত হয়েছে, সেই রূপান্তরকে অবিকৃতভাবে শ্যামা নৃত্যনাট্যে গ্রহণ করা হয়েছে।

পরিশোধ কবিতা—

আহা মরি মরি !
মহেন্দ্রনিন্দিত কান্তি উন্নত দর্শন
কারে বন্দী করে আনে চোরের মতন
কঠিন শৃঙ্খলে ! শীঘ্র যা লো সহচরী
বল গে নগরপালে মোর নাম করি,
শ্যামা ডাকিতেছে তারে ; বন্দী সাথে লয়ে
একবার আসে যেন এ ক্ষুদ্র আলয়ে
দয়া করি !

পরিশোধ নাট্যগীতিতে কথার বিন্যাস অপরিবর্তিত আছে, শুধু সপ্তম চরণে 'এ ক্ষুদ্র আলয়ে' হয়েছে 'আমার আলয়ে'। শ্যামা নৃত্যনাট্যে পংক্তিগুলির পুনর্বিন্যাস ব্যতীত পরিশোধ নাট্যগীতির এই সংলাপ প্রায় অবিকৃতভাবে গৃহীত হয়েছে। ব্যতিক্রম—'শীঘ্র যা লো সহচরী' আগ্রহের আতিশয্য প্রকাশের প্রয়োজনে হয়েছে—'শীঘ্র যা লো সহচরী, যা লো যা লো—।'

পরিশোধ কবিতা

এ কি লীলা, হে সুন্দরী, এ কি তব লীলা!
পথ হতে ঘরে আনি কিসের কৌতুকে
নির্দোষ এ প্রবাসীর অবমানদুখে
করিতেছ অপমান।

পরিশোধ নাট্যগীতি

কী খেলা, হে সুন্দরী, কিসের এ কৌতুক।
কেন দাও অপমান-দুখ—
মোরে নিয়ে কেন, কেন এ কৌতুক। (১)

শ্যামা নৃত্যনাট্য

এ কী খেলা, হে সুন্দরী,
কিসের এ কৌতুক।
দাও অপমান-দুখ
কেন দাও অপমান-দুখ।
মোরে নিয়ে কেন, কেন, কেন এ কৌতুক। (২)

পরিশোধ কবিতা থেকে নাট্যগীতির সংলাপে রূপান্তর হয়েছে সুরগত প্রয়োজনে। শ্যামা নৃত্যনাট্যে সুরের সঙ্গে সংগতি রেখে ভাব-বিকাশের প্রয়োজনে ভাষাগত পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে, 'দাও অপমান-দুখ' একবার নয়, দুবার বলে বজ্রসেন অপমানের বেদনায়; একটি অতিরিক্ত 'কেন' যুক্ত হওয়ায় জিজ্ঞাসা তীব্রতর হয়েছে। এই জাতীয় ছোটখাট পরিবর্তন আরো লক্ষ্য করি—কবিতার 'হায় গো বিদেশী পান্থ, কৌতুক এ নহে', নাট্যগীতির সুরে হয়েছে 'নহে নহে, নহে এ কৌতুক,' নৃত্যনাট্যে ঈষৎ পুনর্বিন্যস্ত হয়ে হলো 'নহে নহে, এ নহে কৌতুক'। কবিতার "আলিঙ্গন ঘনতর করি/'সে কথা এখন নহে' কহিল সুন্দরী।" নাট্যগীতিতে হয়েছে 'নহে নহে নহে, সে কথা এখন নহে', কিন্তু শ্যামার কিঞ্চিৎ গুরুত্ব বাড়িয়ে 'এখন'-কে করা হল 'এখনো'—'নহে নহে নহে—সেকথা এখনো নহে।' ফলে অর্থেরও কিঞ্চিৎ পরিবর্তন হলো। রূপান্তরের আরো একটি উদাহরণ দিই।

পরিশোধ কবিতা

প্রিয়তম,
তোমা লাগি যা করেছি কঠিন সে কাজ,
সুকঠিন, তারো চেয়ে সুকঠিন আজ
সে কথা তোমারে বলা।···
বালক কিশোর
উত্তীয় তাহার নাম, ব্যর্থ প্রেমে মোর
উন্মত্ত অধীর। সে আমার অনুনয়ে
তব চুরি অপবাদ নিজ স্কন্ধে লয়ে
দিয়েছে আপন প্রাণ।

পরিশোধ নাট্যগীতি ও শ্যামা নৃত্যনাট্য—

তোমা লাগি যা করেছি কঠিন সে কাজ
আরো সুকঠিন আজ তোমারে সে কথা বলা—
বালক কিশোর, উত্তীয় তার নাম—
ব্যর্থ প্রেমে মোর মত্ত অধীর।
মোর অনুনয়ে তব চুরি অপবাদ
নিজ 'পরে লয়ে সঁপেছে আপন প্রাণ॥ (৩, ৪)

১ নৃত্য, ১৩৫৬, পৃঃ ১৬

২ শান্তিদেব ঘোষের রবীন্দ্রসঙ্গীত গ্রন্থে উদ্ধৃত, পৃঃ ২২২

৩ Frontiers of Drama—Una Ellis-Fermor (University paperback), 1964, গ্রন্থের অন্তর্গত The Functions of Imagery in Drama প্রবন্ধটি দ্রষ্টব্য।

৪ এই প্রসঙ্গে চিত্রাঙ্গদার ইংরেজি অনুবাদ Chitra বিষয়ে পরবর্তী আলোচনা দ্রষ্টব্য।

৫ রবীন্দ্রসঙ্গীত, ১৩৬৫, পৃঃ ১৫৬

৬ নৃত্য, পৃঃ ১৯। এই বিশ্রামের যুক্তি দিয়েছেন শ্রীশান্তিদেব ঘোষও—"গানের সুরে ও তালে মিশ্রিত অভিনয়ের মাঝে মাঝে এ ধরণের আবৃত্তির অভিনয় দর্শকদের মনের পক্ষে বিশ্রামের কাজ করে।" রবীন্দ্রসঙ্গীত, পৃঃ ২৫২

৭ রবীন্দ্রসঙ্গীত, পৃঃ ২৫০

৮ কথা ও সুর—ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, পৃঃ ৮৭

৯ রবীন্দ্রসঙ্গীত, পৃঃ ২২৯

১০ শান্তিদেব ঘোষ কর্তৃক রবীন্দ্রসঙ্গীত গ্রন্থে উদ্ধৃত, পৃঃ ২৫২

১১ নৃত্য—প্রতিমা দেবী, পৃঃ ২৫-৬

১২ গীতবিতান (অখণ্ড), গ্রন্থ পরিচয়, পৃঃ ১০১৭

১৩ পথে ও পথের প্রান্তে, ১৩৫১, পৃঃ ৮৬ ; ৩৯ সংখ্যক পত্র, চিঠির তারিখ ২৩ শ্রাবণ ১৩৩৬

১৪ গীতবিতান (অখণ্ড), গ্রন্থ পরিচয়, পৃঃ ৯৭৮

১৫ রবীন্দ্রজীবনী ৪, ১৩৬৩, পৃঃ ১২৭

১৬ গীতবিতান (অখণ্ড), পৃঃ ৯২৫

১৭ তদেব, পৃঃ ৯৭০

১৮ রবীন্দ্রজীবনী ৪, পৃঃ ১৫৫-৬ ; রবীন্দ্রনাথও নাকি সমালোচকদের মতো মনে করতেন হত্যাদৃশ্যটি নাটকের দুর্বলতম অংশ। আরো দ্রষ্টব্য, রবীন্দ্রসঙ্গীত, পৃঃ ২৫১। আঁদ্রে মালরো তাঁর The Human Condition উপন্যাসে একটি চরিত্রের মুখ দিয়ে বলিয়েছেন, যে হত্যা করে নি, তার কৌমার্যই ঘোচে নি। আধুনিক সাহিত্যে হত্যা ও হিংসার উল্লেখযোগ্য স্থান লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য। সেই দিক থেকে শ্যামা নৃত্যনাট্য বিশেষভাবে আধুনিক লক্ষণে আক্রান্ত।

১৯ রবীন্দ্র রচনাবলী ১ (প, ব, স) পৃঃ ৬০৮

২০ মালিনী-র সূচনা, রবীন্দ্ররচনাবলী ৫ (প, ব, স) পৃঃ ৪৮৫

২১ কোরাস নামক যূথবদ্ধ চরিত্র, অ্যারিষ্টটলের মতে, 'must be regarded as one of the actors." Greek Tragedy—Kitto. (University Paperback), 1970, P. 161. কী রকম এই চরিত্র ? "They regularly generalize the particular events and interpret the action of the play as the poet would have interpreted." A Handbook of Classical Drama —Harsh, 1965, P. 18-9

২২ এই বিষয়ে Existentialism and the Modern Predicament—Heinemann, 1954, গ্রন্থের আলোচনা দ্রষ্টব্য।

২৩ Existentialism and Humanism-Sartre (অনুবাদ Mairet), 1952, P. 29-32